আরো একজন

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র : ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

মুদ্রাকর : কুশধ্বজ মান্না : মান্না প্রিন্টার্স
৬৭/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট : কলিকাতা-৬

শ্রীসুশীল ঘোষ

ও

শ্রীমতী লীলা ঘোষকে

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্য বই :

আনন্দরূপ

খনির নতুন মণি

পুরুষোত্তম

অপরিচিতের মুখ

বাসকশয়ন

রূপের হাটে বিকিকিনি

মেঘের মিনার

দুটি প্রতীক্ষার কারণে

সিকেপিকেটিকে

ফয়সলা

পিনুডিদার গপ্পো

আরো একজন

শিলং রোড ধরে মেডিক্যাল কলেজে আসতে মাঝামাঝি জায়গায় যে রাস্তাটা তেরছা হয়ে এসে মিশেছে তার নাম জু-রোড। ওই রাস্তায় চিড়িয়াখানা বলে ওই নাম। জু রোড ধরে ওই লোকের গাড়ি একই সময় শিলং রোডে এসে পড়বে। কোনো একটা গাড়ি নয়। রকমারি মডেলের রকমারি গাড়ি। কখনো ঝকঝকে নতুন, কখনো এমন পুরনো আর বেখাপ্পা যে চোখও টানবে, কৌতূহলও হবে। কোনোটা হয়তো ছ'জন আরামে বসার মতো বিশাল, কোনোটা বা দু'জন কুলোয় না এত ছোট। শর্মিলা বরকাকুতির ক্রিম রং-এর চকচকে ফিয়াট গাড়িটার স্পিড আঁচ করে হয় আগে আগে যাবে, নয়তো খানিক পিছনে আসবে। গাড়ি চালানোর পাকা হাত লোকটার অস্বীকার করতে পারবে না। চেষ্টা করেও এই চওড়া ফাঁকা রাস্তায় ওভার-টেক করতে পারেনি। গত-কালও চেষ্টা করেছিল। রিয়ারভিউ গ্লাসে ওর গাড়ির স্পিড বুঝে ঠিক আগে আগে চলেছে। আবার স্পিড কমিয়েও দেখেছে। ওই লোকের গাড়িরও তখন শম্বুক গতি।

জু-রোডের কাছাকাছি এলেই শর্মিলা বরকাকুতির নির্লিপ্ত গম্ভীর দু'চোখ চাপা কৌতুকে সজাগ হবে একটু। আজ আট-ন'দিন হল ব্যাপারখানা লক্ষ্য করছে সে। খেয়াল করলে হয়তো আগেও চোখে পড়ত। কিন্তু এক-একদিন এক-এক রকমের গাড়ি বলেই চালকের দিকে নজর পড়েনি। লোকটা এই কাণ্ড আরো কত দিন ধরে করে চলেছে বলা যায় না। আট-ন'দিন আগের এক ব্যাপারের পর থেকে ধরা পড়েছে।

চওড়া ফাঁকা রাস্তা হলেও শর্মিলার ফিয়াটের অ্যাকসেলেটারে অসংযত পায়ের চাপ বড় একটা পড়ে না। সেই আট-ন'দিন আগে ঘাড় ধরে হাসপাতালে আসার তাড়া ছিল একটু। আগের দিন ডক্টর ভট্টাচার্য জানিয়ে রেখেছিলেন তাঁর আসতে দেরি হবে একটু, না আসা পর্যন্ত সামাল দেয় যেন। আর সেই দিনই বাড়িতে দুই দিদির ঝগড়ার মধ্যস্থতা করতে গিয়ে বেরুতে দেরি।

তাই স্পিডের কাঁটা সত্তরের দাগ ছুঁয়ে ছিল। অবশ্য এ-রাস্তায় সত্তর কিলোমিটার এমন কিছু স্পিড নয়। ওই মোড়টার মুখে বিভ্রাট। বিপত্তি কিছু ঘটেনি। ঘটতে পারত। জু রোড ধরে সেকেলে একটা ফোর্ড গাড়ি বেশ জোরেই আসছে লক্ষ্য করেছিল। কিন্তু শর্মিলা যাচ্ছে মেন রোড ধরে, তাই বাঁক নেবার আগে দরকার হলে ওই গাড়ির স্পিড স্লো হবে ধরেই নিয়েছিল। কিন্তু তা হল না। ফলে ওই সংযোগে দু'জনেরই জোর ব্রেক কষতে হল। শর্মিলার ছোট গাড়ি, লাগলে ছাতু হবার কথা। বাঁক নিয়ে ফোর্ডটা দাঁড়িয়ে গেল। আড়াআড়ি শর্মিলার ফিয়েটও। সামনে-পিছনে ডাক্তারের গাড়ির লাল ক্রস মারা আছে। ভব্যতা থাকলে তাই দেখেও লোকটার স্পিড চেক করে ওকে যেতে দেওয়া উচিত ছিল। তার ওপর মেন রোডের প্রায়রিটি তো আছেই।

ক্রুদ্ধ মুখে গলা বাড়িয়ে শর্মিলা বরকাকুতি বলে উঠেছিল, আর ইউ ব্লাইণ্ড?

দু'হাত জুড়ে লোকটা সবিনয়ে জবাব দিয়েছিল, অল্‌মোস্ট ম্যাডাম।

শর্মিলার আরক্ত চোখ। লোকটার গায়ে ঝকমকে লাল টেরিকটের শার্ট, পরনে কি দেখা যাচ্ছে না। মাথায় তেল না-পড়া শুকনো ঝাঁকড়া চুল। বছর তিরিশ-একতিরিশ হবে বয়েস। হাসি-ছোঁয়া মিষ্টি মুখ। শর্মিলার মনে হয়েছে এ রকম একখানা মুখ আগেও যেন দেখেছে। হাসপাতালে দেখেছে কি এমনি

যাতায়াতের পথে, মনে করতে পারল না।

—উইল ইউ মুভ্ অর গেট্ ব্যাক ?

ভেজা বিড়ালের মতো মুখ করে লোকটা জিজ্ঞেস করেছে, আগে যা'ব না পিছনে থাকব ?

—ননসেন্স।

ওই দশ হাত জায়গার মধ্যেই শাঁ করে পাশ কাটিয়ে শর্মিলা গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিয়েছিল। তারপর রিয়ারভিউ গ্লাসে একাধিক বার দেখেছে ওই ফোর্ড পনের গজ পিছনে আসছে। লোকটা টিপিটিপি হাসছে।

শিলং রোডের বাঁয়ে পাহাড়ের ওপর মেডিক্যাল কলেজ আর হাসপাতাল। পাহাড়ের গায়ে থাক কেটে কেটে ওপরে-নিচে বিল্ডিং। পাহাড়টাকে ঘিরে ওপরে ওঠা আর নামার চওড়া রাস্তা। চার ভাগের তিন ভাগ উঠলে মেডিক্যাল কলেজের প্রথম গেট।

শর্মিলার গাড়ি গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকল। পিছনে ওই ফোর্ড গাড়িও।

গাড়ি জায়গামতো পার্ক করে ব্যাগটা নামিয়ে দরজা বন্ধ করার ফাঁকে শর্মিলার দু'চোখ আপনি ওই ফোর্ড গাড়ির দিকে গেছে। দরজা খুলে লোকটাও দাঁড়িয়েছে। বেশ লম্বা, দোহারা চেহারা। শুধু জামা নয়, পরনের ট্রাউজারও ঝকঝকে দামি। শর্মিলা গাড়ির কাঁচ তোলা আর দরজা লক্ করার ফাঁকে ওর কাছেই এগিয়ে এসেছে। সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, ইমারজেন্সি ওয়ার্ডটা কোন দিকে বলতে পারেন ?

শর্মিলা থমকে তাকিয়েছিল। মনে হয়েছিল আগে যদি হাসপাতালেই দেখে থাকে লোকটাকে, তাহলে সে তার গন্তব্য স্থানও জানে। তক্ষুণি এই বিনয়টুকুও কেন যেন মেকী মনে হয়েছিল তার।

—কি কেস?

—চোখ···আই মিন আই।

শর্মিলা গম্ভীর। মনে হল রাস্তায় ব্লাইণ্ড বলার ফলে এই রসিকতা। জবাব দিল, হার্ট-এর ওপরে আর ই-এন-টি'র (ইয়ার, নোজ, থোটের) পাশে। বলেই টক-টক করে সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে সামনের হল্-এ অদৃশ্য হয়ে গেছল।

তার পরদিন থেকে এই কাণ্ড। এক-এক দিন এক-একটা গাড়ি আর এই জু-রোডের মুখে যোগাযোগ। পাঁচ-দশ মিনিট এদিক-ওদিক করেও দেখেছে, রকমারি গাড়ির ওই চালকের সঙ্গে ঘড়ির হিসেব মিলবেই। হয় আগে যাবে নয়তো পিছনে আসবে। না, মেডিক্যাল কলেজের গেট দিয়ে ভিতরে আর ঢোকেনি। ওর গাড়ি চোখের আড়াল না-হওয়া পর্যন্ত ফটকের উল্টো দিকে গাড়ি থামিয়ে অপেক্ষা করেছে।

দু'তিন দিন এ-রকম হতেই ব্যাপার বুঝেছে শর্মিলা বরকাকুতি। এক-একদিন এক-এক রকমের গাড়ি চেপে আসাটাই যা নতুন, নইলে আর যা সবটাই তার চেনা আর জানা। আঠারো থেকে এই ছাব্বিশ বছর বয়েস পর্যন্ত কম দেখেনি বা দেখছে না। মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময় থেকে ছাত্র আর ছোকরা ডাক্তারদের অনেক ছোঁকছোঁকানি দেখেছে। দু'বছর হয়ে গেল ডাক্তারি পাস করে বেরুনোর পর এখানেই কাজ পেয়ে গেছে। কিন্তু তার মধ্যেও দুই একটি ডাক্তারের সোজাসুজি বা পরোক্ষে প্রেম নিবেদনের ব্যাপার ঘটে গেছে। শর্মিলা তাদের বিমুখ করেছে। কিন্তু কোনরকম আঘাত দিয়ে নয়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, বিলম্বে এসেছ বন্ধু—এ হৃদয়-মন-প্রাণ একজনের কাছে সমর্পিত। তারই প্রতীক্ষার কাল চলছে এখন। কিন্তু সেই ভাগ্যবানটি কে তার হদিস এখনো মেলেনি।

কে-যে, শর্মিলা সেটা নিজেও জানে না। কিন্তু স্তাবককুলকে গণ্ডীর বাইরে রাখতে হলে এই-ই সব থেকে সহজ উপায়।

মেডিক্যাল কলেজের থার্ড ইয়ার থেকেই ও এই রাস্তা ধরে অনেককে বাতিল করেছে। বয়েস এখন ছাব্বিশ। দোসরের চিন্তা এক-একু সময় মাথায় আসে না এমন নয়। মা বেঁচে থাকলে বাবাকে কবেই অস্থির করে তুলত। মা আরো সাত আট বছর আগে গত হয়েছে। দুই দিদি পালা করে বাবাকে তাগিদ দেয়। বাবা প্রমথেশ বরকাকুতি ব্যস্ত আর মেজাজী মানুষ। এই গৌহাটিতেই টী-অয়্যার হাউসের মালিক। ভালো চা বাগানের শেয়ারও আছে। অঢেল কাঁচা টাকার জোরে কোনো সমস্যাই বড় করে দেখেন না ভদ্রলোক। মেয়েরা অল্প-স্বল্প তাগিদ দিলে ব্যস্ত হন, বেশি বললে বিরক্ত। তাঁর আবার হাই ব্লাডপ্রেসার। ছোট মেয়ে চোখের মণি। শরীরের ভাবনা-চিন্তা তার হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। নিয়মিত ব্লাডপ্রেসার চেক করা, শরীর বুঝে ডায়েট ঠিক করা, মাঝে মাঝে ই. সি. জি. করা—সব তার দায়িত্ব। ফলে এই মেয়ের চোখের আড়াল হবার কথা ভাবতেও বুকে বাজে। তবু ভাবতে হয়। দুই একটা ভালো ছেলে নাগালের মধ্যেই আছে। বন্ধু ভূপেন দেবশর্মা তাঁর মতোই মস্ত টী-অয়্যার হাউসের মালিক—এক বছর আগে তাঁর ছেলেটা বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরেছে, ঝকঝকে ছেলে। গৌহাটির হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করছে। পসার কেমন হচ্ছে না হচ্ছে কারো মাথা ব্যথার কোনো কারণ নেই। অঢেল পয়সাঅলা বাপের একমাত্র ছেলে। ভদ্রলোক নিজেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাঁর ছেলের সঙ্গে শর্মিলার বিয়ের প্রস্তাবের আভাস দিয়ে রেখেছেন।

অত ভালো ছেলে পেয়েও বাবা খুব একটা গা পাতছে না কেন শর্মিলা অনুমান করতে পারে। কুশল দেবশর্মার সঙ্গে শর্মিলারও অল্প-স্বল্প আলাপ-পরিচয় আছে। শর্মিলার দিক থেকে এতটুকু সাড়া পেলে আলাপ-পরিচয় ঘনিষ্ঠ হতে সময় লাগত না। বিলেত থেকে ফেরার পর কুশল দেবশর্মা দু'দিন তাদের চাঁদমারির বাড়িতে এসেছে। একদিন বাপের সঙ্গে, আর একদিন একলা। সৌজন্যের

খাতিরেও এরপর শর্মিলার একদিন তাদের বাড়ি যাবার কথা। ফোনে কুশল সেই অভিযোগ করেছে। কিন্তু শর্মিলা তার ডাক্তারি পেশায় এত ব্যস্ত যে সময়ই করে উঠতে পারে না। তাই শুনে ও-দিক থেকে কুশল বলেছে, তার পেশেণ্ট হতে আপত্তি নেই, গেলে ফী-ও দেবে।

কিন্তু বাবা কেন গা করছে না শর্মিলা বোঝে। বড় দুটি ভগ্নিপতির মতো বাপের ব্যারিস্টার ছেলেকে ঘরজামাই করে রাখা যাবে না। শর্মিলার মা ছিলেন গোঁড়া মানুষ। তেমনি রক্ষণশীল গোঁড়া ঘর থেকে বড় দুই জামাই বাছাই করে এনেছেন। মায়ের মতো না হলেও কুল-মানের কদর বাবার কাছেও কম নয়। ষোলো না পেরুতে বড় দুই মেয়ের বিয়ে সারা। এক জামাইয়ের পদবী বরপূজারি, অন্যজনের বরঠাকুর। যার যার বরের কুল-মান নিয়ে দিদিদেরও গর্ব। আর অবস্থাপন্ন শ্বশুরের ঘরজামাই হয়ে থাকাটা এদেশে নতুন কিছু নয়। খাসিয়াদের মধ্যে তো জামাইকে এসে মেয়ের ঘরই করতে হয়, তা যত লেখাপড়াই শিখুক বা যত বিত্তবানই হোক। এদের প্রভাব আর সংস্কৃতির অনেকটাই অসমীয়াদের সঙ্গে মিশে আছে। শর্মিলা মেডিক্যাল কলেজে ঢোকার অনেক আগে থেকেই তার মা অসুস্থ ছিলেন। তখনই ওর পড়া নিয়ে মা আর বাবাতে ফাটাফাটি কাণ্ড। তার ওপর আঠারো বছর হয়ে গেল মেয়ের বিয়ের নাম নেই। ছোট মেয়ের জন্য খুব খেদ আর দুশ্চিন্তা নিয়েই মা চোখ বুজেছেন। বাবা গোঁড়া মানুষ হলেও হালের হাওয়া তাঁর গায়ে লাগেই। নইলে মেয়েকে ডাক্তারি পড়াতেনই না। তাই ছোট মেয়ে যখন সরাসরি বাবাকে এসে বলেছিল, ডাক্তার হয়ে বেরুনোর আগে আর বিয়ের কথা নয়, খুঁতখুতুনি সত্ত্বেও তিনি আপত্তি করেন নি। তারপর এ ক'বছরে শর্মিলা তাঁকে এমনি হাতের মুঠোয় এনেছে যে, মেয়ে কাছে থাকবে না ভাবতে চোখে অন্ধকার দেখেন। শর্মিলারা যেমন চাঁদমারির রইস এলাকায় থাকে, দেবশর্মা-

দেরও বাস তেমনি আর এক অভিজাত এলাকা রিহাবাড়িতে। মাঝে চার মাইল মাত্র ফারাক। কিন্তু বাবার কাছে এটুকুই অনেক দূর।

কিন্তু তা হলেও দুশ্চিন্তা তো একটু মনের তলায় আছেই বাবার। তাই সময়-সময় ছোট মেয়ের কাছেই বিয়ের কথা তোলেন। আর মেয়েও তক্ষুণি সাদা-সাপটা জবাব দিয়ে তাঁর মুখ বন্ধ করে দেয় -এসব ভেবে তুমি মাথা গরম কোরো না তো বাবা, যখন হবার ঠিক হবে।

কিন্তু দিদিদের ঠেকাবে কি করে, তারা বাবার কান ভাঙ্গানি দেবেই। দিদিরা যে হিংসে করে, শর্মিলা সেটা বেশ বুঝতে পারে। চেহারা তিন বোনের কারো খারাপ নয়, তার মধ্যে ওরই বেশি ভালো। কিন্তু বেশি হিংসে লেখা-পড়ার ফারাকের জন্য। বেচারীদের স্কুলের গণ্ডী পেরুনোর আগেই বিয়ে হয়ে গেছে। এক-একজন তিনটে করে ছেলে-মেয়ের মা এখন। দিদিরা হিংসে করে, শর্মিলা কিন্তু মজাই পায়। দিদিদের সন্দেহ, কুল-মান জলাঞ্জলি দিয়ে তাদের এই অতিশিক্ষিতা বোন কবে জানি কার গলায় মালা দিয়ে বসে। তলায় তলায় ভালবাসা-বাসির ব্যাপার কারো সঙ্গে চলছে না—এটা তারা খুব বিশ্বাস করে না। দুই দিদির মধ্যে কথায় কথায় ঝগড়া, কিন্তু ছোটর চলন বাঁকা দেখার ব্যাপারে দু'জনের গলায় গলায় ভাব। ছোট বোন বাবার বেশি আদরের, সে-ও দিদিদের কিছুটা জ্বালা-পোড়ার কারণ। তাই সন্দেহের কথা বলে বাবাকেও বিঁধতে ছাড়ে না তারা।

কিন্তু চেষ্টা করেও বাবার মনে কোনো সংশয়ের আঁচড় ফেলতে পারে না তারা। বাবা তাদের সাফ বলে দেন, আমার মুখ ছোট হবার মতো কোনো কাজ শর্মি করবে না, করতে পারে না। আবার ছোট মেয়েকেও জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁ রে, ওরা কি বলে?

শর্মিলা তখন বাবার সামনেই দিদিদের ধমকে ওঠে, বাজে কথা

বলে আর বাজে চিন্তা মাথায় ঢুকিয়ে কেন তোমরা বাবার ব্লাড-প্রেসার চড়িয়ে দাও ?

দুই দিদিরই তখন পাল্টা রাগ। —তোর চাল-চলন দেখলে কিছু হয় না, আর আমাদের কথা শুনলেই বাবার ব্লাডপ্রেসার চড়ে—কেমন ?

দুই দিদিরই মনে মনে ভয়, বাবা না জানি কবে উইল-টুইল করে বিষয় সম্পত্তি আর টাকাকড়ির অর্ধেক এই ছোট বোনকেই দিয়ে ফেলে। আর ছোট বোনও বাবাকে এই মতলবেই এত বশ করে রেখেছে কি-না কে জানে। ঘরেব দুই জামাইয়ের একজনকেও বাবা যে খুব পছন্দ করে না সে-তো হামেশাই দেখছে। দুজনেই বাবার অয়্যার হাউসে কাজ করে, আর সে জন্যে মাস গেলে মোটা টাকাই হাতে পায়। কিন্তু বাবা কাজের সময় জামাইদের মাইনে-করা কর্মচারীর মত্তোই দেখে, ভুল-ত্রুটি হলে ধমক-ধামক পর্যন্ত করে। সে-জন্যে দিদিদের রাগ হলে ছোট বোন চোখ-কান বুজে বাবার দিকে। তলায় তলায় কোন মতলব হাঁসিলের ফন্দি কে জানে !

বাবার সঙ্গে একান্তে কথা বলতে দেখলেই দুই দিদির একজন না একজন ছুটে আসবে। আর কথা যদি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে পরে জেরা করবে, বাবা কি বলল, বাবার সঙ্গে কি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল।

দুই দিদিকে সেদিন কি জব্দই না করেছিল শর্মিলা। বাবার প্রেসার তখন একটু বাড়তির দিকে। শর্মিলা তাঁকে তিন দিনের পুরো বিশ্রামের কড়া ফতোয়া দিয়ে রেখেছিল। শেষের দিনটা ছিল রবিবার। বাবার প্রেসারও কমেছে। দিদিকে তাতাবার জন্যে শর্মিলা সেদিন বাবার ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। এক দিদি দূরে দাঁড়িয়ে আছে আর ছোট্ট বোন বাবার ঘরে ঢুকল দেখছে। তাইতেই গম্ভীর মুখে শর্মিলা তাকে দেখিয়ে এই কাণ্ড করল।

বাবা একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলেন, দরজা বন্ধ করেছিলি কেন?

শর্মিলা জবাব দিল, ছেলে-মেয়েগুলো বড় হুটোপুটি করছে বাইরে। ছুটির দিন, নিরিবিলিতে বসে তোমার সঙ্গে একটু গল্প করি।

বাবা মহা খুশি।

আধ-ঘণ্টা বাদে দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে দুই দিদি,বই ধার ধার চাউনি। এদিকের ঘরে একলা পেয়েই ছেঁকে ধরল দুজনে, দরজা বন্ধ করে বাবার সঙ্গে এতক্ষণ ধরে কি কথা?

শর্মিলা গম্ভীর—খুব দরকারি কথা।

—দরকারি কথা শুধু তোর সঙ্গে কেন?

—ব্যাপারটা আমাকে নিয়ে।

—তোকে নিয়ে হলেই বা আমরা শুনব না কেন!

—শুনতে পারো কিন্তু ঢাক পিটিয়ে বেড়িও না। আমার বিলেত যাওয়া নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল।

দুই দিদিই আকাশ থেকে পড়ল। —বাবা তোকে বিলেত পাঠাচ্ছে!

—পাঠাচ্ছে না, আমি যেতে চাইছি।

—বাবা কি বলল?

—বাবার আপত্তি। বলল, যেতে হয় বিয়ে করে বরকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। দুজনের জন্য এক লাখের জায়গায় না-হয় দু' লাখ টাকা খরচ হবে আমার। এখন আমি যে কি করি সেই ভাবনায় পড়েছি।

ওর ভাবনা নিয়ে দিদিদের মাথা ব্যথা নেই। তারা জানে ছোট বোনের বিয়ের জন্যে বাবা মোটা টাকা সরিয়ে রেখেছে। তার ওপর আরো দু'লক্ষ টাকা খরচ করে বাবা বরকে সুদ্ধু সঙ্গে দিয়ে ছোট মেয়েকে বিলেত পাঠাবে এ তারা সহ্য করে কি করে! ফাঁক বুঝে

দুজনেই এক সময় বাবার কাছে গিয়ে হাজির।

কিন্তু মেয়েরা কি-যে বলতে চায় ভদ্রলোকের সেটা বুঝতেই সময় লাগল খানিক। বোঝার পর ধমকে তাড়ালেন দুজনকে। বললেন, তাহলে তোদের ভিতরের চরিত্র বুঝে ও কেমন মজা করে সেটাই দেখ—ওর বুদ্ধির ধার দিয়েও তোরা কেউ যাস না।

এ-রকম জব্দ হবার ফলেই দুই বোন আবার ছোটর ওপর রেগে আগুন। কিন্তু শর্মিলার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। ওই ফুটন্ত মেজাজের দিদিদেরই জাপটে সাপটে ধরে হেসে সারা।

বড় বোন ঊর্মিলা ওর থেকে সাত বছরের বড়, আর মেজ বোন প্রমীলা চার বছরের। ছোট বোনের চাল চলনের দিকে কড়া নজর রাখাটা তারা কর্তব্য ভাবে। ঘরে মা নেই, ওদের দায়িত্ব অনেক। তাই বাড়িতে শর্মিলার কাছে পুরুষ মানুষ কেউ এলে দুজনেরই খর দৃষ্টি। বাড়িতে শর্মিলার একটা চেম্বার করে বসার ইচ্ছে, কিন্তু দুই বোনের আপত্তিতে সেটা হয়ে ওঠেনি। হাসপাতালে চাকরি করছে এই ঢের, আর দরকারটা কি? তাদের ধারণা, বাড়িতে চেম্বার বসালে বোনের কাছে রোগিণীর থেকে রোগীর ভিড় বেশি হবে। এ-ব্যাপারে দিদিদের রাগাবার জন্যে ভুলটা শর্মিলাই করেছিল। পুরোপুরি ডাক্তার হবার আগেই দিদিদের কাছে রসিয়ে গল্প করেছিল, ছেলে রোগীগুলোই অস্থির করে মারলে ওকে, কাঙ্গালের মতো সকলেই চায় ওকে দিয়ে চিকিৎসা করাতে। আর আশ্চর্য কাণ্ড, ও কেস হাতে নিলেই ছেলেগুলোর অসুখ অর্ধেক ভালো হয়ে যায়।

ঠাট্টা জেনেও দিদিরা সন্দেহ ছেঁটে দিতে পারে না। তাই সুযোগ পেলে শর্মিলারও মজা করার ঝোঁক। দিনকতক আগের এক ছুটির দিনে ডক্টর ভট্টাচার্য এসেছিলেন বাড়িতে। কোনোকালে বাঙ্গালী ছিলেন, তিন পুরুষ ধরে আসামে থেকে অসমীয়া হয়ে গেছেন। বছর ছত্রিশ সাঁইত্রিশ হবে ভদ্রলোকের বয়েস। শর্মিলা তাকে

বসিয়ে আদর আপ্যায়ন করেছে, চা জলখাবার পাঠাতে বলেছে দিদিদের, আর তার পরেও অনেকক্ষণ গল্প করে কাটিয়েছে।

চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দিদি আর মেজদি এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। —ভদ্রলোক কে রে?

আক্রান্ত হয়ে শর্মিলা যেন সরমে রাঙ্গা। কিন্তু তারাও ছাড়বে না।

—ভদ্রলোক কে বলিস না কেন?

এবার বলল। —ভদ্রলোক সে।

—সে মানে!

—সে মানে কি তোমরা জানো না?

দুই দিদিরই চোখ গোল। —কি নাম?

চোখ-কান বুজে প্রথমে যে নাম মনে এলো সেই নামই বলে দিল শর্মিলা। কিন্তু একটু ভুল হয়ে গেল, নামের সঙ্গে পাল্টি ঘরের একটা পদবীই বলে ফেলল।

অতএব দিদিরা উৎসুক আরো। মেজদি বলল, কিন্তু এঁর বয়েস একটু বেশি মনে হল।

অম্লানবদনে শর্মিলা জবাব দিল, হ্যাঁ সেই জন্যেই খুঁতখুঁত করছে ভেতরটা, তোমার সঙ্গে ভালো মানাতো।

মেজদি রেগে গেল। —বেহায়া মেয়ে, লজ্জাও করে না বাইরের লোককে ঘরে বসিয়ে এক ঘণ্টা ধরে আড্ডা দিচ্ছে।

শর্মিলা খুশিতে আটখানা।—আহাগো মেজদি, ষোল বছর বয়েস থেকে ঘরের লোকের তাঁবেদারি করলে—এতে যে কি রস জানবে কি করে?

দিদি জিজ্ঞেস করল, কি করে—ডাক্তার?

—না। ফিল্ম অ্যাক্টর।

ওদের দুজনকে একসঙ্গে জ্বলতে দিয়ে শর্মিলা ঘর ছেড়ে উধাও।

বাইরে হাসপাতাল আর ঘরে বাবা আর এই দুই দিদির সংসার

নিয়ে শর্মিলার সময় মন্দ কেটে যাচ্ছিল না। দিদিদের আচরণ যেমনই হোক, তাদের তিন-তিন ছ'টি ছেলে-মেয়েই ছোট মাসি অন্ত প্রাণ। ছোট মাসি তাদের আদর্শ। ওদের সামনে ছোট মাসিকে কিছু বলে মায়েরা পার পায় না। ছোট মাসির হয়ে কোমর বেঁধে লড়াই করতে আসবে তারা। আর ছেলে-মেয়েগুলোকে শর্মিলাও যথার্থ ভালোবাসে।

তবু বয়েস ছাব্বিশ হয়ে গেল। জীবনে দোসর একজন আসবে ধরেই নিয়েছে। এখন প্রায়ই মনে হয় সময়ও হয়েছে। কিন্তু চোখে পড়া মনে ধরার মতো মানুষের সত্যি যেন বড় অভাব। ভূপেন দেবশর্মার ছেলে কুশল দেবশর্মার কথাও ভেবেছে। মন্দ কিছু নয়। কিন্তু মন থেকে সে রকম যেন সায় মেলে না। হাসপাতালের যে অবিবাহিত ডাক্তাররা এখনো কাছে ঘেঁষতে পেলে বর্তে যায় তারা কেউ ওর মনের ধারেকাছেও নেই।

শুধু একজন ছাড়া। ডক্টর বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। তাঁকে সত্যি ভালো লাগে। ভালো ডাক্তার। দু বছর আগে বিলেত থেকে এসে গৌহাটির এই হাসপাতালে জয়েন করেছেন। বিলেত ফেরত হলেও ভদ্রলোক ছন্নছাড়ার মতো থাকেন। তার কারণ, দুর্ভাগ্য। লণ্ডন থেকে ফেরার ছ'মাসের মধ্যে তাঁর স্ত্রী মারা যান। একটা মাত্র এগারো-বারো বছরের ছেলে। সেই ছেলেকেও দিল্লিতে ছোট ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

তাঁকে ভালো লাগে। ভদ্রলোকও ওকে পছন্দ করেন, তাও বোঝা যায়। কিন্তু জীবনের দোসর হিসেবে তা বলে তাঁকে ভাবাও যায় না। ভদ্রলোক কখনো কোনো দুর্বল মুহূর্তে প্রস্তাব করে বসেন যদি কি হবে, ভাবতে গেলেও ত্রাস শর্মিলার। নিজেই আবার দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে। সে-রকম লোকই নন বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। চুপচাপ নিজের দুঃখ বয়ে বেড়ায় এমন কিছু লোক আছে দুনিয়ায়। ডাক্তার ভট্টাচার্য সেই গোছেরই একজন।

জু-রোডের মুখে দুই গাড়িতে সেই ঠোকাঠুকি লাগার সম্ভাবনা আর তার পরের বাকবিনিময়ের পর আরো আটটা দিন গেছে। এক-এক দিন এক-এক মডেলের গাড়ি হাঁকানো শৌখিন রঙ-চঙা জামার ওই লোকের সঙ্গে এর মধ্যে চাক্ষুষ সংঘাতের ব্যাপারে এক-দিনের জন্যেও ছেদ পড়েনি। এমন কি গত রবিবারে আউট-ডোরে এসেছিল শর্মিলা, সেদিনও ওই মূর্তিকে দেখা গেছে।

নতুন বা পুরনো মোটর গাড়ি কেনা-বেচার ব্যবসা বোধহয় লোকটার। তাই হরেক রকমের গাড়ি দেখিয়ে ওর চোখ টানার চেষ্টা। শর্মিলা রাগ করে কি করবে, রাস্তা বা মেডিক্যাল কলেজের গেট তো আর তার খাস দখলে নয়। মনে মনে ব্যাপারখানা বরং উপভোগই করে আসছিল শর্মিলা।

জু-রোডের দিকে চোখ পড়তে দেখল, আজ এক ছোট অস্টিন হাঁকিয়ে আসছে। আড় চোখে ও গাড়ির দূরত্ব দেখে নিল। চালানো দেখেই বোঝা গেল আজ ওই লোকের আগে আগে যাবার ইচ্ছে। বেশির ভাগই তাই যায়। কারণ বোঝাও সোজা। সামনের রিয়ারভিউ গ্লাসে পিছনের গাড়ি যে চালাচ্ছে তার স্পষ্ট মুখ দেখতে পায়। ক্ষণে ক্ষণে দেখে যে তাও তার চালানো দেখেই বোঝা যায়। তাতেই বা শর্মিলার ঝাঁঝ দেখাবার কি আছে, তার গাড়ি চালানোয় ব্যাঘাত ঘটলেও এর ফয়সলা করতে পারতো। কিন্তু নিপুণ হাতেই গাড়ি চালায় লোকটা। ওর স্পিড বাড়লে তারও বাড়ে, কমলে কমে—ফারাক মোটামুটি সমান। নিজের গাড়ি চালাতে চালাতে শর্মিলার এক-এক সময় জিভ ভেংচি কাটতে ইচ্ছে করে। কাটলে দেখতে পাবে। কিন্তু হাসপাতালে রওনা হলে শর্মিলা বরকাকুতি একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ডাক্তার। এই প্রশ্রয় সে দিতে পারে না। তাই কৌতুক চেপে গম্ভীর মুখেই নিজের গাড়ি চালায়।

জু-রোড থেকে অস্টিন গাড়িটা আগে এসে শিলং রোডে পড়ল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আজ মাথায় কি দুষ্টুমি চাপল শর্মিলার। বাঁক নিয়ে সাঁ করে নিজের গাড়ি জু-রোডে ঢুকিয়ে দিল। অনেকটা ঘুর পথে যেতে হবে। ঘাড় ঘুরিয়ে শিলং রোডের ওই গাড়ির দিকে তাকালো। লোকটার গাড়ির গতি শিথিল। ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া ওই মুখ দেখে হাসিই পেয়ে গেল শর্মিলার। সামলে নিয়ে জোরে গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

পরদিন।

আগে আগে ওই লোকের শেভ্রলে গাড়ি চলেছে। পিছনে শর্মিলার গাড়ি। কালকের আচরণের দরুন রিয়ারভিউ গ্লাসে ওই লোকের আজ দেখার ঘটা বেড়েছে। সেটা তার চালানো থেকে অনুমান করা যাচ্ছে। স্পিড ঠিক থাকলেও সোজা লাইনে তার ঢাউস গাড়ি চলছে না।

মেডিক্যাল কলেজের সেই পাহাড়ের আধ মাইল দূরে আচমকা এক সত্যিকারের সংঘাত আর বিপত্তি। সামনের এক ক্রসিং-এ বাঁক ঘুরে আসছিল ট্রাক। কিন্তু শেভ্রলে গাড়ির ওই লোক তখন রিয়ারভিউ গ্লাসে পিছনের গাড়ির রমণী পর্যবেক্ষণে এত তন্ময় যে ওই ট্রাকের সঙ্গে হেড-অন কলিশন। বাঁক ঘোরার দরুন ট্রাকটার স্পিডও বেশি ছিল না। তাহলেও মারাত্মক কিছু না ঘটাই আশ্চর্য।

গাড়িটা শেভ্রলে না হয়ে অন্য কোনো ঠুনকো গাড়ি হলে মৃত্যু ঠেকানো যেত না বোধহয়। সত্রাসে দুর্ঘটনার সামনে গাড়ি থামিয়ে শর্মিলা ছুটে এলো। লোকটা অজ্ঞান, রক্তাক্ত। কপাল কেটেছে, মাথা ফেটেছে, বুকেও লেগেছে। বিপাকে পড়ে ট্রাকের ড্রাইভার আর তিন জন লোক এসে শর্মিলাকেই সালিশ মানল। কিভাবে গাড়ি চালিয়ে লোকটা এই কাণ্ড করল বহিনজি সেটা নিশ্চয় নিজের চোখেই দেখেছে। লোকটা নিশ্চয় বে-হেড মাতাল হয়ে গাড়ি

চালাচ্ছিল, নইলে এত বড় রাস্তায় এ-রকম হয় কি করে।

কিন্তু ডাক্তার শর্মিলা বরকাকুতির এসব শোনার সময় নেই। ওদেরই সাহায্যে লোকটাকে তার গাড়ি থেকে নামিয়ে নিজের গাড়ির পিছনে শুইয়ে দিল। ট্রাকের ড্রাইভারও তার সঙ্গে পিছনে থাকল। সে বেচারা প্রাণের দায়ে এলো। হাসপাতাল থেকে পুলিশে রিপোর্ট যাবে—তার নির্দোষিতা প্রমাণের একমাত্র সাক্ষী এই মহিলা। শর্মিলা তাকে আশ্বস্ত করেছে, তার কোনো দোষ নেই। ট্রাক ড্রাইভারের বদ্ধ বিশ্বাস লোকটা এই সকালেই মদ খেয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল।

হাসপাতালের ইমারজেন্সি ওয়ার্ডে আনা হল লোকটাকে। সেখান থেকে অপারেশন টেবিলে। তখনো অজ্ঞান। শর্মিলা বরকাকুতি নিজের গাড়িতে পেশেন্ট তুলে এনেছে তাই আরো ডাক্তার আর সার্জনও হাজির। তারা পরীক্ষা করছে। শর্মিলা বাইরে দাঁড়িয়ে। তার বুকের তলায় কাঁপুনি। রক্তাক্ত আহত মানুষটার সুশ্রী মুখখানা বড় করুণ দেখাচ্ছিল। থেকে থেকেই কেবলই মনে হচ্ছে, গতকাল ও ওই কাণ্ড না করলে লোকটা আজ এত বেহিসেবী হয়ে রিয়ারভিউ গ্লাস দিয়ে ওকে এভাবে দেখতে চেষ্টা করত না।

ঘণ্টা দুই বাদে বড় সার্জন জানাল, আঘাত ততো গুরুতর নয়, গাড়ির কাঁচে কপাল আর মাথা বেশি কেটেছে। বুকের হাড়ও ভাঙেনি তবে বেশ জোরেই লেগেছে। অত জায়গায় কেটেছে, সেপটিক না হয় লক্ষ্য রাখা দরকার। জ্ঞান ফিরে আসার আগেই আবার ইঞ্জেকশান দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হবে।

আপাতত ইমারজেন্সিতেই রাখা হল তাকে। কারণ অনেক রক্ত গেছে। রক্ত দেবার দরকার হতে পারে। তাছাড়া অজ্ঞান অবস্থাতেই অ্যানেসথেশিয়া দেওয়া হয়েছে। কপালের থেকেও মাথার ক্ষত বেশি, পাঁচ-ছ'টা স্টিচ পড়েছে। ফের ব্লিডিং হয় কিনা নজর রাখা দরকার।

সব ব্যবস্থা করে শর্মিলা বেলা বারোটার মধ্যেই হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে পড়ল। আউট-ডোরের দিক মাড়ালই না। মাথাটা এখনো ঝিমঝিম করছে। লোকটার নাম পর্যন্ত জানে না যে খোঁজ করে তার বাড়িতে একটা খবর দেবে। ফেরার সময় দেখল, মুখ তুবড়নো শেভ্রলে গাড়িটা রাস্তার এক-পাশে সরিয়ে রাখা হয়েছে। ট্রাকের লোকগুলোই ঠেলে সরিয়েছে হয়তো।

বিকেল পাঁচটা নাগাত আবার হাসপাতালে না এসে পারল না। আগে ভেবেছিল, টেলিফোনে খবর নেবে। শেষে চলেই এলো।

হেড নার্স এগিয়ে এসে জানান দিল, তার রোগী খুব ভালো আছে, কথাবার্তা কইছে। এর মধ্যে দু-তিনবার খবর নিয়েছে ডাক্তার মিস বরাকুতি বিকেলে আসেন কিনা বা আজ আসবেন কিনা। আর ধন্যবাদ জানানোর জন্য উঠে তাকে একটা টেলিফোন করতে চেয়েছিল। হেড নার্স বলেছে, আপাতত তার বিছানায় উঠে বসারও হুকুম নেই।

শর্মিলা গম্ভীর। ভিতরে ভিতরে রাগই হচ্ছে। মরতে বসেছিল তাও শিক্ষা হয়নি। যেভাবে হোক ওর নামও জেনে রেখেছে।

দূরে দূরে বেড। কোণের বেড এ ওই লোক। ভিতরে ঢুকে শর্মিলা গম্ভীর মুখে সেদিকে এগুলো। সমস্ত মাথা আর কপাল জুড়ে ব্যাণ্ডেজ। বুকেও। নার্স তার মুখে থার্মোমিটার গুঁজে দিয়ে অপেক্ষা করছে। সেই অবস্থায় ওকে দেখা মাত্র দুই চোখে আর মুখে আনন্দের ঢেউ। সেটা এত স্পষ্ট যেন তারই প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে ছিল এতক্ষণ। শরীরে কোনরকম যন্ত্রণার লেশমাত্র নেই যেন। সেই অবস্থাতেই দু-হাত তুলে ব্যাণ্ডেজ মোড়া কপালে ছোঁয়ালো। অর্থাৎ নমস্কার করল।

শর্মিলা দেখছে। মাথাও নাড়ল না।

নার্স মুখ থেকে থার্মোমিটার টেনে নিয়ে দেখল। শর্মিলা

জিজ্ঞাসু চোখে তার দিকে তাকাতে সে অস্ফুট স্বরে বলল, হাণ্ড্রেড থ্রী পয়েণ্ট সিক্স।

শর্মিলা হুকুম করল, একটা ক্রোসিন গুঁড়িয়ে দাও, ট্যাবলেট গিলতে অসুবিধে হবে। লোকটার দিকে ফিরল, আপাদ-মস্তক দেখে নিল একবার। তারপর প্রথমেই যে প্রশ্নটা করল, পেশেণ্টের অবস্থাবিবেচনায় সেটা প্রায় অকরুণ।—ইমারজেন্সি ওয়ার্ডের হদিশ পেলেন?

ন'দিন আগে ওকে ফলো করে হাসপাতাল কম্পাউণ্ডে ঢুকে প্রথমেই ইমারজেন্সি ওয়ার্ডের খোঁজ করেছিল লোকটা, ভোলেনি। রোগীও ভোলেনি নিশ্চয়। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মুখে খুশির ঘাটতি নেই। জবাব দিল, আমার অনেকগুলো রোগ আছে শর্মিলা দেবী (লোকটার মুখে নিজের নাম শুনে শর্মিলার দুই ভুরু আপনা থেকে কুঁচকেছে একটু), তার মধ্যে একটা হল কবিতা পড়া। একজন ফেমাস বাঙ্গালী কবির একটা কবিতার ট্রানস্লেশান পড়েছিলাম। কবিতাটা হল, একটা ছোট্ট মুরগীর সামনের বড় দালানে ঢোকার বড় সাধ ছিল—সেখানে না জানি কত খাবার, কত আনন্দ। একদিন সে ঢুকতে পেলো, একেবারে খাবারের ডিশে খাবার হয়ে। আমার প্রায় সেই দশা। ছ'মাস ধরে আপনার সঙ্গে একটু যোগাযোগের বড় সাধ ছিল, একেবারে কপাল ভেঙ্গে আপনার রোগী হয়ে ঢুকলাম।

ভিতরে ভিতরে শর্মিলার সত্যি অবাক লাগছে একটু। মেয়েদের পিছু নেওয়া পয়সা-অলা লোফারের মতো কথাবার্তা নয়। ছ'মাস ধরে তার সঙ্গে যোগাযোগের সাধ শুনে অবাকও একটু। কিন্তু কোনরকম কৌতূহল দেখানোর ধার দিয়েও গেল না। নির্লিপ্ত মুখে জিজ্ঞেস করল, কি নাম?

—মোহন।...মোহন হাজারিকা।

হাজারিকা শুনে শর্মিলার চোখে কৌতুকের ছায়া নামল একটু। কৌতুকের কারণ, এ-রকম চিন্তা মাথায় আসার কোনরকম হেতু ধরা

ছোঁয়ার মধ্যেও নেই। ···লোকটার ছ'মাস যাবত তার সঙ্গে যোগাযোগের ইচ্ছে। সে-ইচ্ছে যদি কোনরকম অন্তরঙ্গতার দিকে এগোতে চায় তো বাবা হাজারিকা শুনেই ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাড়ির বার করবে। এ-রকম উদ্ভট চিন্তা মাথায় এলো বলে নিজের ওপরেই বিরক্ত আবার।

রোগীর সামনের টাঙানো চার্টটা দেখে নিল। যে আঘাত পেয়েছে জ্বর হতেই পারে। আরো সতের রকমের উপসর্গ দেখা দেওয়াও বিচিত্র কিছু ছিল না। কিন্তু লোকটাকে দেখে তার মুখের হাসি দেখে আর কথা শুনে মনে হয়, বেশ আরামের শয্যায় শুয়ে আছে।

মোহন হাজারিকা পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে সাগ্রহে বলল, বসুন—

শর্মিলা তেমনি নিস্পৃহ।—বসতে হবে?

লোকটা একেবারে দুহাত জোড় করে অনুনয়ের সুরে বলল, একটু বসুন, আমি দোষ যা করেছি তার শাস্তি তো ভগবান দিয়েছে, আপনি আর দেবেন কেন, আপনি তো আর তার মতো অকরুণ নন।

শর্মিলার মজাই লাগছে। ছ'মাস ধরে তার এত যোগাযোগের বাসনা কেন, তাও জানা হয়নি। বসল, কিন্তু কথায়-বার্তায় ডাক্তার-সুলভ গাম্ভীর্য।

বসল বলেই লোকটার মুখে আবার আনন্দ ধরে না। শর্মিলার সব থেকে অবাক লাগছে শরীরে কোনরকম ব্যথা বেদনার লেশমাত্র নেই যেন। চারের কাছাকাছি জ্বর, তাও মুখ দেখে বোঝা যাবে না। নার্স ওষুধ খাইয়ে দিয়ে চলে যেতে উৎফুল্ল মুখে বলল, এঁদের কাছে খোঁজ নিয়ে জানলাম বিকেলে তেমন জরুরী কাজ না থাকলে আপনি আসেন না। তবু সেই থেকে আমি খুব আশা করছিলাম, আপনি আজ একবার আসবেন।···যে জন্যেই আসুন,

আমার ভাবতে খুব ভালো লাগছে আপনি আমাকে দেখতেই এসেছেন।

শর্মিলা ঠিক হাসছে না। লোকটার মুখের ওপর তার চোখ দুটো হাসছে। যদি সত্যি জবাব দেয়, যদি বলে তাকে দেখতেই এসেছে—তাহলে কি হবে? দরকার নেই। আনন্দের চোটে হয়তো মাথার বা কপালের স্টিচই ছিঁড়ে যাবে। বরং বিমর্ষ হবার মতো কথাই বলল।—আমি এমনি একবার দেখতে এলাম, আপনার কেস সার্জনের হাতে।

লোকটার আনন্দ সত্যি মিলিয়ে যেতে লাগল। জিজ্ঞেস করল, বুকে যন্ত্রণা আছে, হাড়গোড় ভেঙেছে?

—না।

—মাথায় কি হয়েছে?

—মাথা আর কপালের অনেক জায়গা কেটে গেছে। কয়েকটা স্টিচ পড়েছে।

এবারে ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞেস করল, আমাকে কি দু'চার দিনের মধ্যেই ছেড়ে দেওয়া হবে?

শর্মিলার সত্যি হাসি পাচ্ছে। কিন্তু হাসতে পারছে না। দু'চার দিন ছেড়ে দশ পনের দিনের মধ্যেও ছাড়ার সম্ভাবনা নেই তাও জানে। তবু জবাব দিল, কমপ্লিকেশন না থাকলে আর আটকে রাখবে কেন, আউট-ডোরে এসে সার্জনকে দেখিয়ে যাবেন, তিনি সময় বুঝে স্টিচ কেটে দেবেন।

লোকটার বুক ঠেলে যেন দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো একটা। —তাহলে দেখুন এক-চোখা ভগবান কত অকরুণ, ছোট-মোট দুই-একটা হাড়-টাড় ভাঙলে এমন কি ক্ষতি হত!

শর্মিলা এবারে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াতে গেল। কিন্তু লোকটা একেবারে হাত বাড়িয়ে বাধা দিল তাকে। —দয়া করে আর একটু বসুন, আমার তো কিছুই বলা হল না।

শর্মিলা রাগ করবে না অবাক হবে? লোকটা কি এত বেপরোয়া যে পারলে তাকে হাত ধরেই চেয়ারে বসিয়ে রাখে। আর ওঠার চেষ্টা না করে বসল ঠিকই। কিন্তু গম্ভীর। বলল, আপনি ডাক্তারের সঙ্গে কথা কইছেন ভুলে যাচ্ছেন।

অবাধ্য ছেলের মতো মোহন হাজারিকা বলে উঠল, আমি কিচ্ছু ভুলছি না। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। এই তো সাড়ে তিনের ওপর জ্বর শুনলেন। কমপ্লিকেশন দেখা দিতে কতক্ষণ। কিন্তু কোনো কষ্ট কোনো যন্ত্রণা সেভাবে টের পাচ্ছি না আপনি বসে আছেন বলে। আর একজন থাকলেও টের পেতাম না, যাক সে কথা। কিন্তু এই সামান্য সত্যি কথাটা বললেও আপনি রেগে যাবেন কেন? সার্জনের কেস বলে আপনি যদি আর না আসেন না দেখেন, তাহলে এক্ষুণি ওদের ডাকুন, আমি না থাকলে আমাকে জোর করে কে ধরে রাখবে? আজই চলে যাব। এই জীবনটার জন্যে আমি থোড়াই পরোয়া করি। বুঝলেন? শোয়া থেকে ছিটকে উঠে বসল।

শর্মিলার দু'চোখ তার মুখের ওপর স্থির একেবারে। এ সত্যি কি লোকের পাল্লায় পড়ল সে? কথা-বার্তা শুনে মাথা খারাপ মনে হয় না। প্রথমেই যে কবিতার উপমা দিয়েছিল তাও কম সরস ছিল না। কিন্তু তা বলে এমন বেপরোয়াভাবে কেউ এগিয়ে আসতে পারে, কল্পনার বাইরে।

ধমকের সুরেই বলল, ছেলেমানুষি করবেন না, স্টিচ ছিঁড়ে গেলে ক্ষতি হবে, শুয়ে পড়ুন।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটাও চোখ পাকালো।

—আমার স্টিচ ছিঁড়বে তাতে আপনার কি?

শর্মিলা হাঁ কয়েক মুহূর্ত। সত্যি যেন একটা বাচ্চা ছেলে খুব আপনার জনের কাছে কিছু আবদার করে, আর তা না পেয়ে আক্রোশে নিজেকে ছিঁড়েখুঁড়ে জব্দ করতে চায়। এই আচরণ

কৃত্রিম হলে শর্মিলার চোখে ধরা পড়ত। হাল ছেড়ে শর্মিলারই আত্মস্থ হওয়ার চেষ্টা। শাসনের সুরেই বলল, আপনি আর পাঁচ সেকেণ্ড বসে থাকলে আমি উঠে চলে যাব! শুয়ে পড়ুন।

মোহন হাজারিকা তক্ষুণি শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে এক মুখ হাসি। বলল, আপনি বসে থাকলে আমি ঠাণ্ডা হয়ে শুয়ে শুয়ে শ্মশানেও চলে যেতে পারি।

ডাক্তার হোক আর যা-ই হোক, বুকেব তলায় মেয়ে তো একটা আছেই। শর্মিলার ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। মুখস্থ কবে বা রিহার্সাল দিয়েও এত অনায়াসে এমন কথা বলা যায় কিনা জানে না। আধ ঘণ্টাও হয়নি এখানে এসে বসেছে, কিন্তু এরই মধ্যে মানুষটা যেন কোনো অদৃশ্য কিছু দিয়ে আষ্টে-পৃষ্টে বেঁধে ফেলার সঙ্কল্প নিয়ে এগোচ্ছে তাব দিকে।

অস্বস্তি বোধ কবছে বলেই আরো গম্ভীর। —আপনার বাড়ির লোক কাউকে দেখছি না, অ্যাকসিডেণ্টেব খবর দেওয়া হয়নি ?

হাসছে। জবাব দিল, আমার বাড়িতে একটাই লোক, সে এখানে এই বেডে শুয়ে—কাকে খবর দেব ?

হাসি সবল। কথা সরল। সবই এত সহজ আর সরল বলেই শর্মিলা যেন ফাঁপরে পড়ছে। চকিতে মনে পড়ল কিছু। জিজ্ঞেস করল, একটু আগে বলছিলেন, আর একজন আপনার কাছে বসে থাকলেও কষ্ট বা যন্ত্রণা টের পেতেন না···তিনি কে ?

—আমার মা। ওই ঠাকরোনটির আস্কারা পেয়েই তো যত বিভ্রাট, নইলে বেশ তো ছিলাম।

এতক্ষণে দুর্বোধ্য লাগছে শর্মিলার—তাঁর আস্কারা পেয়ে কি বিভ্রাট ?

—আমার এই ছ'মাস যাবত মাথা খারাপ দশা আর এই অ্যাক্সিডেণ্ট।

শর্মিলা বিমূঢ় খানিক।—তাঁকে খবর দেন নি কেন? তিনি কোথায় এখন?

এবারেও এক গাল হাসি। আঙুল তুলে জানলা দিয়ে আকাশ দেখিয়ে দিতে হল।—তাঁকে খবর দিতে হলে আমাকেও ওইখানে যেতে হয়।

জবাব শুনে শর্মিলার দু'চোখ লোকটার মুখের ওপর এঁটে বসছে এবারে। সত্যিই মাথায় কোনো গোলযোগের লক্ষণ কিনা দেখছে। কিন্তু আশ্চর্য, লোকটা তাও আঁচ করল। বলে উঠল, কি হল, পাগল-ছাগলের পাল্লায় পড়লেন কিনা ভাবছেন বুঝি?

শর্মিলা সামাল দেবার আগেই হাসতে হাসতে সে আবার বলল, দেখুন আপনি কেন, আমার ব্যবহারে আমি নিজেই অবাক হচ্ছি। কিন্তু কথা আছে না, ওই এক-চোখা ভগবান সদয় হলে পঙ্গু পাহাড় টপকায়, আর বোবার মুখে কথার ফুলঝুরি ছোটে—আমারও সেই দশা। ওই ট্রাকটার নম্বর নিয়ে রেখেছেন তো? খুঁজে পেতে তাকে মোটা বক্‌শিস দিয়ে আসতে হবে।

না, শর্মিলা এ-রকম কোনো পুরুষের মুখোমুখি আজও আসেনি। তবু বোঝার চেষ্টা। জিজ্ঞেস করল, আপনার মা কোথা থেকে কিভাবে আপনাকে আস্কারা দিলেন? আর সেটা কি?

এবার লোকটার দু'চোখে সত্যি কি-যেন এক অদ্ভুত তৃষ্ণা। চেয়ে আছে। জবাবও দিল। বলল, সেটা বলার সময় আজ নয়। বলব—বলতে তো হবেই।

চাউনিরও কি কোনো স্পর্শ আছে? আজ এই ছাব্বিশ বছর বয়েস পর্যন্ত পুরুষের জোড়া জোড়া চোখ কম তো ওর দিকে ধাওয়া করেনি। কিন্তু এ-রকম এক অবশ-করা অনুভূতির অভিজ্ঞতা শর্মিলার আর তো হয়নি।

—আজ তাহলে উঠি?

সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুল মুখ।—এরই মধ্যে উঠবেন?

শর্মিলা ঘড়ি দেখল।—এরই মধ্যে নয়, অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। এরপর এখানকার এরাই অবাক হবে।

তখুনি বুঝল—কাল কখন আসছেন তা হলে ?

জবাবটাও যেন সে ওই দুই চোখের আকুতি দিয়েই টেনে বার করল। শর্মিলা হাসতেই চেষ্টা করল।-সকালে আগে তো হাস-পাতালে আসি, তারপর।

কিন্তু সকালের মধ্যেই হাসপাতালের ব্যবস্থার কিছু অদল-বদল হয়ে গেল। ইমারজেন্সি ওয়ার্ডে আরো কিছু রোগী এসে পড়েছে। সকালের ডাক্তার এসে মোহন হাজারিকাকে জেনারেল ওয়ার্ডে সরানোর ব্যবস্থা করল। কিন্তু সে আর দশজন পেশেন্টের সঙ্গে থাকতে রাজি নয়। সমস্ত রাত জ্বর গেছে, শরীরও মোটেই ভালো লাগছিল না। ইমারজেন্সি ওয়ার্ডেও এমনিতে আরো রোগী আছে। সে বায়না ধরল, তার আলাদা ক্যাবিন চাই। চার্জ যা লাগে দেবে।

ক্যাবিন খালি আছে। টাকার জোর থাকলে আপত্তি হবার কোনো কারণ নেই। তাছাড়া স্টাফরা জানে, 'ডক্টর শর্মিলা বরকাকুতি এই পেশেন্ট এনেছে। সেই ব্যবস্থাই হল। ক্যাবিনে থাকলে ফী গুণে আলাদা নার্স রাখার নিয়ম। আলাদা নার্সও এলো একজন। কিন্তু সকাল ন'টা না বাজতে জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ অবস্থা মোহন হাজারিকার। শরীরটা যেন বিষিয়ে যাচ্ছে। মাথায়

অসহ্য যন্ত্রণা। ক্যাবিনে শুয়ে হুঁশ ফিরলেই নতুন নার্সের কাছে ডাক্তার মিস বরকাকুতির খোঁজ করে। বার বার বলেছে, আসা মাত্র তাকে যেন খবর দেওয়া হয়।

শুধু তাকে কেন, তার আগে নার্স ছোটাছুটি করে হেড নার্স আর অন্য ডাক্তারকে খবর দিয়েছে।

তারা এসে কত ওষুধ খাইয়েছে বা ক'টা ইঞ্জেকশান দিয়েছে হাজারিকা টেরও পায়নি। কখনো ঘুমিয়েছে, কখনো বা ঘোরেব মধ্যে কেটেছে। তার মধ্যেও মাথায় খুব যন্ত্রণা।

একবার একসময় খুব প্রত্যাশিত একখানা মুখ কাছে দেখল। তার দিকেই ঝুঁকে আছে। বড় করে করে তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করল। তারপর হাসল। বিড়বিড় করে বলল, অনেকক্ষণ ধরে আশা করে বসে আছি, এতক্ষণে সময় হল। তারপরে আবার আচ্ছন্ন ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল। শর্মিলাকে দেখে আর চিনে যন্ত্রণার যেন কিছুটা উপশম হয়েছে।

কিন্তু রোগী জানেও না এটা বিকেল এখন। শর্মিলা সকালে ঘুরেফিরে বহুবার এসেছে। আউটডোরের পরেও ঘণ্টাখানেক বসেছিল। আবার বিকেলে এসেছে। এসে নার্সের মুখে শুনল সে দুপুরে চলে যাবার পরে থেকে থেকে এইরকমই হচ্ছে। হুঁশ ফিরলে চারদিকে চেয়ে কাউকে খোঁজে। তারপর আবার আচ্ছন্ন ভাব।

চিকিৎসার কোনরকম ত্রুটি হয়নি। শর্মিলার তদবির তদারকের ফলে আর তার চেষ্টায় হাসপাতালের বড় ডাক্তার আর সার্জন এই রোগীর দিকে একটু বেশি নজর দিয়েছে। তাদের ধারণা পেশেন্ট ওর আপনার জন কেউ হবে। এমন কি ডক্টর বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যও তাই বুঝে ফাঁকে ফাঁকে রোগী দেখে গেছে। তবু তিন-তিনটে দিন বেশ সংকটের মধ্যেই কেটে গেল।

প্রথম দিনের পর জ্ঞান মোটামুটি ছিল। কিন্তু রোগীকে কড়া সিডেশনে রাখার ফলে খুব বেশিক্ষণ এক নাগাড়ে চোখ তাকিয়ে

থাকতে পারেনি। তবু তারই মধ্যে শর্মিলাকে দেখলে এক মুখ হাসি। ছেলেমানুষি খুশির অভিব্যক্তি এমনি অকপট যে অন্য ডাক্তার আর ডক্টর ভট্টাচার্যের চোখেও পড়েছে। শর্মিলা বিব্রত বোধ করেছে। আর ফাঁক পেলেই ওকে কাছে ডেকে কথা বলার চেষ্টা। শর্মিলা ধমকে থামিয়েছে প্রত্যেকবার। বলেছে, কথা বলে আর অনিয়ম করে প্রথম দিনে ওই বিভ্রাট বাধিয়েছেন, কপালের আব মাথার দুটো করে স্টিচ ছিঁড়ে ছিল। ফের একটুও অনিয়ম করলে আমাকে আর এ-ঘরে দেখতে পাবেন না।

কিন্তু কথা বলে নয়, শুধু দুটো চোখ দিয়েও অদ্ভুত টানতে জানে লোকটা। এও যে কতবার অনুভব করেছে ঠিক নেই।

এই রোগীর দায় নেবার পর সে কেবল কর্তব্যই করে গেছে। যত অস্বস্তি নিরিবিলিতে যখন একা থাকছে শর্মিলা। ও চাক বা না চাক, মনের তলায় অনাগত ছায়া পড়ছেই—পড়ছেই। রোগী ছেড়ে এ-যাবত এ-রকম মানুষই সে আব দেখেছে কিনা জানে না। ছেলেমানুষের মতো হাসি, ছেলেমানুষের মতো বায়না, ছেলেমানুষের মতোই রাগ আর গোঁ। অথচ লোকটার কিছুই জানে না এখনো। রোজই বাড়ি ফিরে ভাবে, এবারে হাসপাতালে আর পাঁচজন রোগীর মতোই ব্যবহার করবে তার সঙ্গে। চেষ্টাও করে। কিন্তু নার্স এসে বার বার জানান দেয়, পেশেন্ট ক্ষেপে যাচ্ছে, এবারে না এলে ব্যাণ্ডেজ টেনে ছিঁড়ে ফেলবে বলছে।

এখন ভালো আছে একটু জানে। তাই বাড়ি ফেরার আগে একবার দেখা করে যাবার সঙ্কল্প শর্মিলার। কিন্তু তার আগেই ছুটতে হয়। কারণ, সত্যি ভাবে মুখে যা বলছে ওই লোক কাজেও তাই করতে পারে। গিয়ে একবার পড়লে আর সহজে ছাড়ান নেই, সেদিন তো ওই নার্সের সামনেই ওঠার সময় খপ করে একখানা হাত ধরে ফেলল। মুখে দুষ্টু-দুষ্টু হাসি। নার্সটা নিশ্চয় তাই দেখেই বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। শর্মিলার চোখে মুখে স্পষ্ট বিরক্তি। কিন্তু

ওই লোকের ভ্রূক্ষেপ নেই। বলল, আবারও তো একটা সুযোগ দিয়েছিলাম, নিলেন না কেন?

—কিসের সুযোগ?

- আমার হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার। তিন দিন নাকি দিন-রাতের বেশির ভাগ অজ্ঞানের মতো ছিলাম। যত্নআত্তি করে টেনে তোলার কি দরকার ছিল, দিব্বি টেঁসে যেতাম।

—আমি যত্ন-আত্তি করেছি আপনাকে কে বলেছে?

—আমাব এই নার্সটি ভালো, গল্পে গল্পে সব বলে দিয়েছে। গত-কালই সে বলছিল, হাসপাতালে এত সেবা-যত্ন আর সর্বদা বেডেব পাশে এত সব বড় বড় ডাক্তাব কমই জোটে। শুধু আপনার জন্যেই নাকি এ-যাত্রা বেঁচে গেলাম।

শর্মিলা কি করবে, নার্সকে গিয়েই ধমক লাগাবে? কিন্তু ওই মুখে হাসি ভাঙছে আবার। আবাবও কিছু বলবে। কিন্তু যা-ই বলুক শর্মিলার শুনতে ভালো লাগে কেন? এই কারণে নিজেব ওপবেই বিরক্তি।

কিন্তু মোহন হাজারিকার মনে যা এসেছে বলবেই। বলল, আসল ব্যাপারখানা কিন্তু ওই নার্সকে শুনিয়ে দিতে খুব ইচ্ছে করছিল, শুধু আপনার কথা ভেবেই বলিনি…।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে শর্মিলা সামনের চেয়ারে বসল। —কি আসল কথা?

—বলতে পাবতাম, আপনার জন্যেই অ্যাক্সিডেন্টে প্রাণটা যেতে বসেছিল, আবার আপনার জন্যেই বেঁচেছে এ আর বেশি কথা কি?

শর্মিলা গম্ভীর হঠাৎ। —আপনার মতলবখানা কি?

মোহন হাজারিকা সচকিত।—কেন?

—এ-রকম করেছেন কেন, আর এ-সব কথা বলছেন কেন? আমি বেশি কিছুই করিনি আপনার জন্য। রোগী ভালো করাই আমাদের কাজ।

—আপনি তাহলে আগে একটা সত্যি কথা বলুন। আমার মতো রোগী আপনি আগে আর কখনো পেয়েছেন?

শর্মিলা হেসে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে সরেও গেল। নাগালের মধ্যে পেলে আবার হাত ধরবে জানা কথা।

কিন্তু রাতে ঘুম কমে আসছে শর্মিলার। ও কি করবে? এই এক অদ্ভুত মানুষের খপ্পর থেকে সে নিজে অব্যাহতি চায় কিনা তাও যেন একেবারে নিশ্চিতভাবে স্থির করা যাচ্ছে না। প্রেমে পড়া কাকে বলে শর্মিলা সঠিক জানে না। কিন্তু ও নিজে যে এ-রকম কিছুতে হাবুডুবু খাচ্ছে না এটা ঠিক। কিন্তু অব্যাহতি পেতে হলে ওই লোককে যে আঘাত দিতে হবে সে-রকম জোরই বা ভেতর থেকে পাচ্ছে না কেন? বরং সেই আঘাতের ফলে সরল মানুষটার বেদনার্ত মুখ কল্পনা করতে গেলে নিজের ভেতরটাই কেমন টনটন করে ওঠে।

এত তাড়াতাড়ি সেরে উঠছে বলেই আবার নিজের ওপর অবুঝ রাগ লোকটার। ভালো আছে, মাথা আর কপালের ঘা-ও শুকিয়ে গেছে স্বীকার করতেই চায় না। শর্মিলা কেন, অন্য ডাক্তার শরীবের খবর নিতে এলেও বলে, একটুও ভালো নেই, খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু কি খারাপ লাগছে সেটা আর ভালো করে বুঝিযে উঠতে পারে না। কখনো বলে বুকে ব্যথা কখনো বলে মাথায়। কিন্তু ফের এক দফা বুক আর মাথা এক্সরে করেও কোথাও কোনরকম গলদের হদিস মেলেনি।

নার্স বা হেড নার্স ব্যাপার বুঝেই ফেলেছে। এরপর কি ওই অবুঝ লোকের জন্য ডাক্তারদের কাছেও অপদস্থ হবে শর্মিলা?

ঠাণ্ডা মুখে সেদিন বিকেলে তার ক্যাবিনে এসে বসল। কাগজ-পত্র রেডি করে এনেছিল। বলল, এই ওয়ার্ডের ইনচার্জ কালই ছেড়ে দিচ্ছেন। সকালের দিকে যাবেন—তার আগে পেমেণ্ট যা আছে করে দিয়ে যাবেন।

মোহন হাজারিকা লাফিয়ে উঠল প্রায়, এক্ষুণি আমাকে ডিসচার্জ করা হবে কেন? আমার শরীর এখনো খুব খারাপ।

—আপনার শরীর এখন খুব ভালো। আপনি কি ক্যাবিন আঁকড়ে থেকে সকলের কাছে আমাকে অপদস্থ করতে চান?

এবার থমকালো। কিন্তু তার পরেও গোঁ ধরে বলল, দু'দিন চারদিনের মধ্যে শরীর তো আবার খারাপ হতেও পারে।

শর্মিলার হাসি পাচ্ছে, মায়াও হচ্ছে। কিন্তু বুঝতে দিলে বিপদ। তেমনি গম্ভীর ভাবে জবাব দিল, খারাপ হলে আউট-ডোরে আসবেন, নয়তো আমাকে খবর দেবেন—আমি বাড়ি গিয়ে দেখে আসব।

সঙ্গে সঙ্গে খুশিতে আর আগ্রহে উদ্ভাসিত। খবর দিলে আপনি সত্যি যাবেন?

—আমার কেস হলে আমি যাব, নইলে যার কেস হবে তাকে পাঠাব।

—অন্যের কেস মানে? হাণ্ড্রেড পার্সেণ্ট আপনার কেস—আপনাকেই যেতে হবে।

শর্মিলা এবার না হেসে পারল না। তারপরেই আবার গম্ভীর।—আচ্ছা আমিই যাব।

—ঠিক আছে। তাহলে আমিও কালই যাব।…কিন্তু টাকা-কড়ি তো আমি সঙ্গে নিয়ে অ্যাক্সিডেণ্ট করিনি, আমার অফিসে না গেলে টাকা দেব কি করে? এখান থেকে গিয়ে ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে পাঠিয়ে দিতে পারি।

এই প্রথম তার একটা অফিস আছে জানল শর্মিলা। কৌতূহলও হল একটু।—তাই দেবেন, আমি অফিসে বলে দেব'খন।…আপনার কি অফিস?

এবারে যেন লোকটা সচকিত একটু। গম্ভীরও।—আমার বিজনেসের অফিস।

—এতদিনের মধ্যে আপনার অফিস থেকেও তো কেউ একটা খবর নিতে এলো না ?

—দুপুরের দিকে প্রায়ই এসেছে। প্রথম পাঁচ-ছ'দিন তারা কোনো খবরই পায়নি, নেবে কি করে ? তারপর আমি এখান থেকে টেলিফোন করতে এসেছে। নইলে এই জামা-পা-জামাগুলো এলো কোথা থেকে ? ভাঙা গাড়িটা পর্যন্ত ছ'দিন ওই রাস্তায় পড়েছিল জানেন ? আপনিও একটা বার মনে করিয়ে দেননি, ওটার জন্য আমার বিস্তর লোকসান হয়ে যাবে।

যে-ভাবে বলল, লোকসানটা যেন শর্মিলার জন্যেই।

—কিন্তু আমার কাণ্ড দেখুন, চেক বইটাও ওদের দিয়ে যেতে বলে দিতাম।...না তাই বা কি করে হত, চেক বই তো আমার শোবার ঘরে তালা বন্ধ। ঠিক আছে কালই পাঠিয়ে দেব।

শর্মিলা জিজ্ঞেস করল, আপনার কি বিজনেস ?

যে-মানুষ সর্ব কথায় এত সরল, এই প্রশ্ন শুনে সে এমন থমকালো কেন বোঝা গেল না। রগড় করে জবাব দেবার মতো করে বলল, মোটর গাড়ির কারবার, আই অ্যাম অ্যান অটো-এনজিনিয়ার।

মোটর গাড়ির কারবার যে শর্মিলা আগেই অনুমান করেছিল। নইলে নিত্য নতুন গাড়ি আসবে কোথা থেকে ? এই সঙ্গে অটো-এনজিনিয়ার আবার বাড়তি কি ছাপ সে-সম্পর্কে শর্মিলার কোনো ধারণা নেই।

মোহন হাজারিকা চটপট এ-প্রসঙ্গ বাতিল করে ফেলল। বলল, কাল তাহলে আবার সেই জু-রোডের মোড়েই আপনার সঙ্গে দেখা হচ্ছে আমার ?

—না, কক্ষনো না।

—কাল না হোক পরশু থেকে ?

—না। আপনি আর কক্ষনো ওভাবে গাড়ি নিয়ে তাড়া করবেন না। বরং আপনার টেলিফোন নম্বর রেখে যান, আর

এখানকার ফোন নম্বর তো আপনার জানাই আছে। ইচ্ছে করেই বাড়ির ফোনের কথা মুখে আনল না।

মোহন হাজারিকা অবাধ্য ছেলের মতো মাথা নাড়ল। বলল, টেলিফোনে তো আর মুখ দেখা যায় না। তার কি হবে?

প্রশ্নটা এত সোজা সরল বলেই শর্মিলার বিড়ম্বনা। দায়সারা জবাব দিল, আচ্ছা, আপনি বাড়ি গিয়ে ক'দিন বিশ্রাম তো করুন, তারপর দেখা যাবে।

বিকেলের আলোয় টান ধরেছে। মোহন হাজারিকা উঠে আলোটা জ্বেলে দিল। নার্সকে আরো সাত-আট দিন আগেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ঘর বলতে গেলে জবরদখল করে বসেছিল, চব্বিশ ঘণ্টার নার্স শর্মিলাই বাতিল করে দিয়েছিল। দরজার পর্দাটা টেনে দিয়ে মোহন হাজারিকা আবার সামনে বসল। মুখে আগের মতোই দুষ্টু হাসি। মাথায় কিছু প্ল্যান গজিয়েছে যেন।

—আচ্ছা, সেই গোড়ার দিনে আপনাকে আমি বলেছিলাম, মায়ের আস্কারা পেয়ে আমার ছ'মাস যাবত মাথা খারাপ দশা আর সেই জন্যেই এই অ্যাক্সিডেন্ট—আপনার মনে আছে?

শর্মিলার খুব ভালই মনে আছে। আজ এই লোক সে-প্রসঙ্গ না তুললে শর্মিলা হয়তো নিজেই জিজ্ঞেস করত। জবাব না দিয়ে মাথা নাড়ল, মনে আছে।

—আর আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার মা কোথা থেকে কিভাবে আমাকে আস্কারা দিল। তখন আমি বলেছিলাম, সময়ে বলব, বলতে তো হবেই—মনে আছে?

কি বলবে এখনো কিছুই ঠাওর করে উঠতে পারছে না শর্মিলা। তবু একটু সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন। কারণ, এই লোকের মতে আজ এমন কিছু বলার সময় যা সেদিন বলা যায়নি। দু' কান আপনা থেকেই সজাগ একটু।

একটা স্মৃতি যেন কাছে এগিয়ে আসছে। মোহন হাজারিকার ঠোঁটের চুপল হাসি মিলিয়ে যাচ্ছে। বলে গেল, আপনাদের জেনারেল ওয়ার্ডের ছ'মাস আগের অর্থাৎ ছ'মাস আগের রেজিস্ট্রার খুলে দেখুন সেখানে আমার মায়ের নাম পাবেন। নাম পার্বতী হাজারিকা। সেখানে চোদ্দ নম্বর বেডে ছিল। কেস সিরিয়াস বলে আপনারা রাতে বাড়ির একজনকে থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন। তখনো তাকে আমি ক্যাবিনে রাখতে পারতাম আর তাই রাখতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু মা কোনো বাজে খরচ সহ্য করতে পারত না। করলে রেগে যেত। আমি সকালে রাতে প্রায় সমস্ত দিনই মায়ের কাছে থাকতাম।

...ছ'মাসে কত শত রোগী হাত দিয়ে বেরিয়ে গেছে শর্মিলার মনে পড়ার কথা নয়, পড়লও না। কিন্তু প্রথম দিন নজর করা মাত্র এই লোকের মুখ বেশ চেনা-চেনা লাগছিল কেন, শর্মিলা এবার বুঝতে পারল।

কিছু জিজ্ঞেস করতে হল না। সে-ই আবার বলে গেল, তখন একটানা একুশ দিন আপনাকে দেখেছি, মায়ের কেস আপনার হাতে ছিল। আপনাকে দেখলেই মায়ের যন্ত্রণা যেন অনেক কমে যেত। আপনার সেবা-যত্ন আর দায়িত্ববোধ দেখে মা মুগ্ধ। আপনি রোজ তাকে দেখে চলে গেলেই তার মুখে কেবল আপনার কথা। আপনার হয়তো মনে নেই, আমার মা আপনাকে মা বলেই ডাকত।

শর্মিলার আবছা মনে পড়ছে এখন। সুশ্রী একটি বয়স্কা রমণীর মুখের আদল এই লোককে দেখে একটু মনে করতে পারছে। ওকে বলেছিল, মাগো আমাকে যেমন করে পারো বাঁচিয়ে তোলো— নইলে আমার ছেলেটার কি হবে, ওর যে কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই— ও-যে আমাকে ছাড়া আর কিছু জানে না।

মোহন হাজারিকা বলল, শেষের তিন দিন মায়ের জ্ঞান ছিল না। ভেঙে পড়ার ভয়ে আমি খুব কাছে আসতে পারছিলাম না।

একটু দূর থেকে তখন আপনাকেই বিশেষ করে দেখেছি, আপনার মুখের দিকে চেয়ে মায়ের অবস্থা বুঝতে চেষ্টা করেছি। আপনি সকালে এসেছেন, দুপুরে এসেছেন, রাত্রিতে এসেছেন। একজন ছাত্র ডাক্তার মায়ের কি ব্যাপারে ভুল করেছিল বলে আপনি ভীষণ রেগে গিয়ে তাকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিলেন। ·· আর শেষের দিনের শেষ ক'ঘণ্টা আপনি মায়ের বেড-এর কাছ থেকে নড়েন নি। ঘণ্টায় পাঁচ-সাতটা করে ইঞ্জেকশন দিয়েছেন। আমাব তখন চিৎকার করে আপনাকে নিষেধ করতে ইচ্ছে কবছিল।

শর্মিলা চেয়ে আছে। শুনছে।

একটু থেমে মোহন হাজারিকা আবার বলে গেল, মায়ের অভাব আমার বুকের সব বাতাস বুঝি টেনে নিল। আমি পাগলের মতো ছটফট করতাম, রাতে ঘুম হত না। কিন্তু তখন আব এক কাণ্ডও হত। মায়ের মুখ ভাবতে গেলে সঙ্গে আপনাব মুখও চোখে ভাসত। তখন আধার খুব ভালো লাগত। আমি চোখ বুজে লোভীর মতো মাকে দেখতাম আর আপনাকে দেখতাম। এ রকম দেখতে দেখতে একসময় ঘুম এসে যেত। একদিন এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলাম, মা খুব হাসছে আর আপনার কথা কি যেন বলছে। তার পরের দু-দুটো দিন আর এক স্বপ্ন। আমি বিয়ে করে বউ নিয়ে ফিরেছি। মা আনন্দে আটখানা হয়ে বউ বরণ করছে।

শর্মিলার মুখের ওপর মোহন হাজারিকার দু'চোখ জ্বল জ্বল করছে। শর্মিলা তাকাতে পারছে না, কিন্তু চোখ ফেরাতেও পারছে না।

—সে বউ তুমি! তুমি তুমি তুমি!

শর্মিলা এই অতি আধুনিককালের মেয়ে। বিজ্ঞান পড়েছে। তবু শ্রী পাস করেছে। হেসে উঠলে অস্বাভাবিক কিছু হত না। এমনগার বদলে সমস্ত গায়ে রোমাঞ্চ। চোখে পলক পড়ছে না। থেবোথস্থ হয়ে হাসতে চেষ্টা করল মোহন হাজারিকাই। বলল,

ছুদিন ওই স্বপ্ন দেখে নিজেরই মাথা খারাপ ভাবতে চেষ্টা করলাম। বামন হয়ে চাঁদে হাত! কিন্তু মাথাটা এরপর আর একভাবে খারাপের দিকেই এগোতে লাগল। যেভাবে হোক তোমাকে একবার করে দেখার লোভ। আরো আশ্চর্য, স্বপ্নের সেই বিয়ের পর সত্যি সত্যি আমার রোজগার যেন লাফিয়ে বাড়তে থাকল। ফলে দেখাব লোভে আমি পাগলের মতোই কাণ্ড করতে লাগলাম। যত কাজই থাক, সকালের ওই সময় আমি গাড়ি নিয়ে ছুটে বেরুতাম। এই করে লোভ থেকে আরো বড় লোভ, তোমার চোখে পড়ার জন্য এক-একদিন এক-এক রকমের গাড়ি নিয়ে বেরুতাম। শেষে মরিয়া হয়ে একদিন ওই মোড়ে তোমার গাড়ি আটকে দিলাম; তারপর থেকে তুমি লক্ষ্য করলে।

উঠে কাছে এলো। উত্তেজনা আর নিবিড় প্রত্যাশার এমন ছুটো চোখ শর্মিলা আর বুঝি দেখেনি। স্থান কাল ভুলে সে-ও চেয়ে আছে।

হঠাৎ শক্ত ছুটো হাতে ওর ছুই গাল চেপে ধরে ঠোঁটের ওপর চুমু খেয়ে বসল মোহন হাজারিকা।

ছু'হাতে তাকে ঠেলে সরিয়ে ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়াল শর্মিলা। তিন হাত পিছনে সরে দাঁড়াল। এমন পলকে ঘটে গেল ব্যাপারটা, যেন অবিশ্বাস্য।

মোহন হাজারিকা হাসছে এখন। বলল, এর পর সাধ্য থাকলে আমাকে বাতিল কোরো।

শর্মিলা ঘর ছেড়ে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল।

বাতিল করার প্রশ্ন আর নেই। কিন্তু বাড়ি সামলাবে কি করে শর্মিলা ভেবে পায় না। মোহন হাজারিকা ছেলে মানুষের মতোই এক-একটা উদ্ভট পরামর্শ দেয় বা প্ল্যান করে। কখনো বলে, এই গৌহাটি ছেড়েই দুজনে পালিয়ে যাই চলো। যেখানে আমাদেব কেউ চিনবে না জানবে না এমন কোথাও গিয়ে তুমি প্র্যাকটিস শুরু করবে, আর আমি আমার ব্যবসা ফেঁদে বসব। আবার কখনো বলে, কি হবে প্র্যাকটিস করে বা ব্যবসার জোয়াল কাঁধে তুলে। ওই করলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কতক্ষণ আর দুজনে দুজনকে পাব। তার থেকে আমার দেশের বাড়িতে পালাই চলো। তুমি যেটুকু পারো, গাঁয়ের মানুষের উপকার করবে, আর আমি নিজের জমি চাষের বন্দোবস্ত করবো। বেশি টাকা বা বেশি মানের আমাদের দরকার নেই।

এ-সব ব্যাপারে একেবারে কাঁচা বুদ্ধি মানুষটার। শর্মিলা ব্যঙ্গ করে বলে, হ্যাঁ, নিত্যি নতুন গাড়ি হাঁকিয়ে গাঁয়ে গিয়ে এখন তুমি চাষী হবে, আর আমি নিজের গাড়ি চেপে হাসপাতালে আর শহরে প্র্যাকটিস করে এখন কলাটা-মুলোটা ফী নিয়ে গাঁয়ের রোগী দেখি! ভালো থাকতে হলে টাকা মান দুই-ই দরকার।

অমনি মাথা ঝাঁকিয়ে আপত্তি। —টাকা যেটুকু দরকার ঠিক এসে যাবে, আর মান আমরা দুজনে দুজনকে যা দিতে পারব, তার বেশি বাইরের মানুষের মান কাড়ার চিন্তায় কাজ নেই।

বাস্তব বুদ্ধি যার এমন, সে মোটর গাড়ির ব্যবসা চালায় কি করে শর্মিলা ভেবে পায় না। তার ধারণা; ওর জন্যে ব্যবসাতেও লোকটার ক্ষতি হচ্ছে। পারলে এখন থেকেই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আঠারো ঘণ্টা তার সঙ্গে কাটায়। তার ওপর টেলিফোন তো আছেই। এখন পর্যন্ত বাড়িতে টেলিফোন করা নিষেধ বলে রাগ। বাবার নাম দেখে টেলিফোন নম্বর নিজেই বার করে নিয়েছে। শর্মিলা ভয় দেখিয়েছে, বোকার মতো ফাঁস করে দিলে শেষে বিয়েই ভেস্তে যাবে। বাবার কথা আর দিদিদের কথা যে-ভাবে বলেছে, তাতে বাড়িতে ফোন করার সাহস আর হয়নি।

শর্মিলার আরজেন্ট কল না থাকলে রোজ বিকেলে দেখা হয় দুজনের। কবে কোথায় দেখা হবে, তারপর কোনদিন কোথায় যাবে, সেটা শর্মিলাই ঠিক করে দেয়। এই লোকের ধৈর্য বলে কিছু নেই, একটা দিন কোনো কারণে আসতে না পারলে বা কথার খেলাপ হলে যেমন রাগ তেমনি অভিমান। মুখের ওপর বলে দেয়, সে যোগ্য নয় বলেই এত অবহেলা—বলে, আসলে ভালোবাসা-টাসা কিছু নয়, আসলে এটা ওর ওপর দয়া। দয়া করতে কত আর ভালো লাগে।

আবার নিরিবিলিতে পেলেই অবুঝের মতো খেসারত আদায় করে। ওর সঙ্গে বেশি নিরিবিলি কোথাও যেতে ভয়ই করে শর্মিলার। একটা সেমিনারে পর পর দুদিন ব্যস্ত ছিল। দেখা হয়নি। তার পরেই ছুটির দিন, রবিবার। রাগের খেসারত হিসেবে দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার সঙ্গে তার ইচ্ছে মতো বেড়াবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল শর্মিলা। তারপর যা কাণ্ড, মনে পড়লে গা-মাথা ঝিমঝিম করে। নিজের গাড়িতে মোহন হাজারিকা আট মাইল দূরে বশিষ্ঠ আশ্রমে নিয়ে এসেছিল ওকে। বেড়াবার মতোই জায়গা, ভালো পিকনিক স্পট—শর্মিলা অনেকবার এসেছে। পাহাড় থেকে তিনটে ঝরনা যেখানে এসে মিলেছে সেখানে মন্দির, আশ্রম।

দুপুরে এমনিতেই লোকজন নেই, নিঝুম জায়গা। তার মধ্যে গাছ-গাছড়ার আড়ালে এমন এক জায়গায় এসে বসে ছিল ওকে নিয়ে, যে গোড়া থেকেই অস্বস্তি শর্মিলার। তার ওপর মুখের সেই দুষ্টু দুষ্টু হাসি দেখে কেন যেন উঠে পড়ার তাগিদ।

...হঠাৎ ওর পাশেই আঙুল দেখিয়ে সাপ সাপ বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল লোকটা। আর বিষম চমকে শর্মিলা বসা থেকে সরে ওর গায়ে এসে পড়েছিল।... তারপর সাপেরই বাঁধন যেন। চেষ্টা করেও সেই বাঁধন আর ছাড়িয়ে উঠতে পারছিল না। ধরাশায়ী দুজনেই। সর্বাঙ্গে সে এক অবুঝ দুরন্ত আসুরিক হামলা। শর্মিলা আর পেয়ে উঠছিল না। দেহ অবশ। মুখে বলেছিল, এই মুহূর্তে না ছাড়লে আমাকে তুমি বরাবরকার মতো হারালে।

ওই ক'টা কথাই যেন মাথার ওপর মুগুরের আঘাত। ছেড়ে দিয়েছিল।

সেই থেকে শর্মিলার দুশ্চিন্তা আরো বেশি। এমন অবুঝকে কত দিন আর ঠেকিয়ে রাখবে? তাছাড়া নিজেরও ভিতরে কিছু তাড়া নেই বললে মিথ্যে হবে। কিন্তু বাবা আর দিদিদের কথা ভাবলেই সব ঘুলিয়ে যায়। কি করবে ঠিক করে উঠতে পারে না।

...দুই দিদিই নিজের নিজের স্বার্থ নিয়ে আছে। দুজনেরই দেওর আছে একটি করে। আর বাড়িতে তাদের আসা যাওয়াও আছে। দুজনেই তারা শর্মিলাকে রসগোল্লাটির মতো মুখে ফেলে গেলার জন্য হাঁ করেই আছে। দিদিরা যে-যার দেওরের পক্ষে। দিদির মতে তার দেওরের তুলনা নেই, আর মেজদির মতে তার দেওরটি নিখাদ রত্ন। এই নিয়ে কতবার দু বোনের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে শর্মিলা নিরীহ মুখে বসে মজা দেখেছে। কখনো দিদিকে বলেছে, মেজদি তোমার দেওরের নামে এই এই বলছিল।

কখনো মেজদিকে জানিয়েছে, দিদি তোমার দেওরের সম্পর্কে কি যাচ্ছেতাই না বলল।

ব্যস্। তার পরেই দুই বোনের তুমুল বচসা। শর্মিলা তখন ভালো মুখ করে বাবার কাছে পালিয়ে বাঁচবে।

বোনেদের আসল লক্ষ্য বাবার টাকা আর বিষয়-আশয়। শর্মিলা দুজনের মধ্যে যার গলায় মালা দিক, তিন-ভাগের দু'ভাগ সম্পত্তি তাদের দিকে গেল। একমাত্র বাঁচোয়া, বাবা মুখে কিছু না বললেও ওই দুজনের একজনকেও পছন্দ করে না। নইলে যে-যার দেওবেব জন্য দিদিরা বাবার কাছে কম সুপারিশ করেনি। বাবা টললে কোনো একজনের সঙ্গে বিয়ে এতদিনে হয়েই যেত। এদের থেকে বাবার মনে মনে বরং বন্ধুর বিলেত-ফেরত ব্যারিস্টার ছেলে কুশল দেবশর্মাকে ঢের বেশি পছন্দ।

কিন্তু শর্মিলা এখন বাবাকেই বা বোঝায় কি করে। গোড়ায় তো জাতকাঠের ব্যাপার নিয়েই হুলস্থুল হবে একটা। দিদিরা শত্রুতা করবেই, কিন্তু ওর মুখ চেয়ে বাবা যদি নরম হয়ও একটু ছেলের বাড়ি-ঘর দেখেই আরো বিগড়ে যাবে। মোহন ওর কথা শুনে একটু বেশি জায়গা-জমির মধ্যে কম করে তিনখানা ঘরের একটা বাড়ির খোঁজে উঠে-পড়ে লেগেছে। কিন্তু খুব উঠে-পড়ে লেগেছে শর্মিলার বিশ্বাস হয় না—সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ব্যবসার ধান্ধায় থাকে, বিকেলের পর থেকে তো সন্ধ্যা পর্যন্ত ওর সঙ্গে। আসলে লোকটার নিজের চাহিদা খুব বেশি নেই, ওর তাড়া খেয়ে যেটুকু চেষ্টা।

মোহনের ঘর বা বাসা দেখে শর্মিলা নিজেই একটু দমে গেছল। প্রথমে তো বাসায় নিয়ে যেতেই চায়নি। বলেছে, অন্য বাসা দেখছি, বিয়ের পর তো আর ওখানে তোমাকে নিয়ে থাকা যাবে না।

কিন্তু শর্মিলা জোর করেই এসেছে। বলেছে, তাহলেও শ্বশুর-

শাশুড়ীর ভিটে দেখাবেও না নাকি ?

মোহন হেসেই জবাব দিয়েছে, আসল ভিটে দেশে। এই বাসা আমিই করেছি, বাবা মারা যাবার পর মা বছরে চার-ছ'মাস করে এসে থাকত।

জু-রোডে ছিটে বেড়ার ওপর একখানা মাত্র বড় মাটির ঘর। তার ওপর অবশ্য সুন্দর রং করা। এখানকার অনেক বড় লোকদেরও অবশ্য এমনি রং করা ঘর। কিন্তু তার চেহারা অন্যরকম। ঘর দেখে প্রথমেই বাবার কথা মনে হয়েছিল শর্মিলার। দেখলেই তার মেজাজ খিঁচড়ে যাবে।

জিজ্ঞেস করেছে, একটা মাত্র ঘর, তোমার মা থাকতেন কোথায় ?

—এই ঘরেতেই মায়ে-ছেলেতে দিব্বি থাকতুম। তারপরেই সাগ্রহে বলেছে, আচ্ছা শর্মি, পাশের জমিটুকুতে তো আর একখানা ঘর তোলা যায়, তাই ক'রে ফেলি না কেন। দু'খানার বেশি ঘরের আমাদের দরকার কি ? ওটা বসার ঘরও হবে আবার তোমার চেম্বারও হবে—ইয়ে, নিজের পয়সায় করা তো·· তাই মায়া পড়ে গেছে, তা ছাড়া মা ছিল এখানে, ছাড়তে ইচ্ছে করে না।

শর্মিলা বিপাকেই পড়েছিল একটু। অসুবিধেটা ঠিক বোঝাবে কেমন করে। আবার মায়ের স্মৃতির প্রতি এতটুকু অসম্মান দেখাতে চায় না। বলল, এটা যেমন আছে তেমনি থাক, তোমাতে আমাতে মাঝে মাঝে এসে থাকব এখানে, তাছাড়া রোজ এসে মায়ের ফটোতে মালা দেব, ধূপধুনো দেব।

দেয়ালে মোহনের মায়ের একখানা বড় ছবি টাঙানো ছিল, আর তাতে মালা পরানো ছিল। ছবি দেখেই শর্মিলা হাসপাতালের সেই রোগিনীকে চিনেছে। শর্মিলা সেই ছবির উদ্দেশে দু'হাত জুড়ে প্রণাম করে আবার বলেছে, এ-টুকুর মধ্যে আর একটা ঘর তুললে আরো খারাপ দেখতে হবে, ছোটখাটো কম্পাউণ্ডের মধ্যে একটা বাড়ি দেখো আপাতত, বাবা এই বাড়ি দেখলে একটু অসুবিধে হবে।

এটুকুতেই অবুঝ ছেলের অভিমান—বাবা তো আর এখানে থাকছেন না, আসল অসুবিধে তোমার হবে।

—দেখো, বোকার মতো কোরো না। বাবাকে আগে বশ করার পর যেভাবে খুশি আমাকে নিয়ে থেকো—তখন কিছু বলব না। তারপর জিজ্ঞেস করেছে, তোমার অফিসটা কোথায়?

অদূরে একটা মোটর গ্যারাজ। সেখানে খানকয়েক গাড়ি মেরামত হচ্ছে। সেদিকে চেয়ে মোহন হাজারিকা বলল, পান-বাজারে।

—চলো দেখে আসি।

সঙ্গে সঙ্গে মোহনের মুখ আরো বিরস। জবাব দিয়েছে, পাঁচ মাইল ঠেঙিয়ে এখন আপিস দেখতে যাবে। আর দেখারই বা কি আছে, খুপরি ঘরের অফিস একটা—তোমার বাবার মতো অয়্যার-হাউস বা চা-বাগানের অফিস তো নয়—ওই দেখেও তুমি নাক সিঁটকোবে। আর কি দেখতে চাও, ব্যাঙ্কের পাশ বই?

শর্মিলা সন্ত্রস্ত। কিছু বলার আগে আবার প্রশ্ন, বি-এস-সি পাশের সার্টিফিকেটও এখানেই আছে—বার করব?

জবাবে শর্মিলা ভুরু কুঁচকে চেয়েছিল খানিক। তারপর দরজাটা হাত দিয়ে ঠেলে ভেজিয়ে দিয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। রাগ-রাগ মুখ। খপ করে দু'হাতে চুলের মুঠি ধরে টেনে আলতো করে নিজের দুই অধরে ওই দুটো ঠোঁট ছুঁয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে একেবারে বাইরে। এটুকু নিজের নিরাপত্তার জন্য। বাইরে থেকেই বলেছিল, আমি আর কিছু দেখতে চাইব না, কিছু বলব না—হল?

রাগ জল তক্ষুণি। পরে শর্মিলা নিজের আপাত সমস্যাটা বুঝিয়ে বলতে কথা দিয়েছিল, সেদিন থেকেই বাড়ির খোঁজে নিজে লাগবে, অন্যকেও লাগাবে।

অনেক ভেবে সহজ সত্যের ওপরেই দু-পা ভর করে দাঁড়াতে চেষ্টা করল শর্মিলা। বাবার সেদিন ব্লাডপ্রেসার দেখার কথা নয় তবু জোর করে দেখল। ভালোই আছে। আব্দারের সুরে বলল, তুমি বারণ করা সত্ত্বেও প্রেসার কেন চেক করলাম, জানো?

বাবা হেসেই জবাব দিলেন. গার্জেনগিরি ফলানোর জন্য, আবার কেন।

—তা না। এক্ষুণি তুমি আমার ওপব রাগ করবে। তাই আগে থাকতে প্রেসারটা দেখে নিলাম। বলেই একেবারে পায়ে হাত দিয়ে অনুনয়ের সুরে বলল, সত্যি বলো বাবা, যতো দোষই করি, আমাকে তুমি ক্ষমা করবে? রাগ করবে না?

প্রমথেশবাবু এবারে সত্যি অবাক।— আমার রাগ করা আর ক্ষমা করার মতো কি করতে পারিস তুই?

—করেছি। তুমি কথা দাও।

বাবার মন। ঠিকই সন্দেহ করলেন. জিজ্ঞেস করলেন, কাউকে পছন্দ করে বসে আছিস?

শর্মিলা ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়ল। তাই করেছে।

প্রমথেশবাবু আরো গম্ভীর কিন্তু গলার স্বর উদ্বিগ্ন।—আমাদের পালটি ঘর?

মেয়ে মাথা নাড়ল। না।

—কি নাম?

বলল।

বাবা একেবারে চুপ খানিক। তারপরে বিষণ্ণ সুরে বললেন, এতটা এগোবার আগে আমার কথা একবার ভাবলি না?

—ভেবেছি বাবা, তুমি তো উদার, তুমি কেন কাউকে ছোট করে দেখবে? আমি সত্যিকারের সুখী হলে তুমি খুশি হবে না বাবা?

প্রমথেশবাবু সে কথার কোনো জবাব দিলেন না। বললেন, এ

বিয়ে হলে আমার কাছে তোর থাকা হবে না, দিদিরা আপত্তি করবে।

শর্মিলা জবাব দিল, দিদিরা কেন কি চায় আর তাদের কি স্বার্থ এ তুমি ভালোই জানো বাবা। তুমি আমাকে আশীর্বাদ করলে আর আমি কিছু চাই না– দেবশর্মাদেব বাড়িতে বিয়ে হলেও তো তোমার কাছে থাকতে পেতাম না।

—ছেলেটি কি পাস ? কি কবছে ?

-বি-এস-সি, তাছাড়া অটো এনজিনিয়াব না কি বলে। মোটর-গাড়িব ব্যবসা, রোজগার ভালোই করে। পানবাজারে নিজের অফিস --

--বাড়িতে আর কে আছে, বাড়ি ঘর দেখেছিস ?

এবারে ঢোঁক গিলতে হল শর্মিলাব। তাই আগের কথার ওপবেই জোর দিল, বলল, তিন কুলে আর কেউ কোথাও নেই বাবা, তার মা আমার পেশেণ্ট ছিলেন, সাত আট মাস আগে তিনিও গত হয়েছেন। দেশে ওদের জায়গা-জমি ঘর-দোর আছে—এখানে বলতে গেলে কিছুই নেই, জু-রোডেব ওপর নিজের এক ঘরের বাসা, ওখানে তো আর আমি থাকতে পারব না, তাই ভালো একটা বাড়ির খোঁজে আছে—

প্রমথেশবাবুর মুখে আবার কথা নেই কিছুক্ষণ। তারপর অন্য দিকে চেয়ে বললেন, ব্যবস্থা তো সব পাকাই করে ফেলেছিস, আমার বুলার আর অপেক্ষা কি। কবে বিয়ে ?

—তুমি এ-ভাবে বললে আমার খুব খারাপ লাগবে বাবা। কবে বিয়ে সে আমি জানি না, এখন তোমার কষ্ট হচ্ছে বাবা, কিন্তু আমি বলছি দেখা হলে আর আলাপ হলে তোমার নিশ্চয় ভালো লাগবে —একেবারে বাচ্চা ছেলের মতো সোজা-সরল—

প্রশংসা করতে গিয়ে শর্মিলার নিজের মুখই রাঙিয়ে উঠল। বাবা চেয়ে আছেন তার দিকে।

—আচ্ছা নিয়ে আসিস একদিন। আর তোর দিদিদের এখন কিছু বলিস না।

শুনেই মাথা ঝাঁকালো মোহন হাজারিকা।—ও বাবা, তোমার বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারব না, ভয় করছে—

—এতখানির পর এই কথা শুনে শর্মিলার রাগ হয়ে গেল। —তাহলে থাক, বিয়ে করতে হবে না।

মোহন হাঁসফাঁস করে উঠল, বিয়ে করতে হবে না মানে?

—বাবার সঙ্গে দেখা করবে না, কথা কইবে না, তার মেয়েকে বিয়ে করবে কি করে?

একটু ভেবে মোহন প্রস্তাব করল, তার থেকে আগে দুজনে কোথাও পালিয়ে গিয়ে বিয়েটা করে ফেললে হত না?

শর্মিলা রাগবে কি হাসবে ভেবে পেল না।—তুমি কি সত্যি ছেলেমানুষ? কিছুই বুঝতে চাও না? পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করলে পরে বাবা আর আমাদের মুখ দেখবে?

—না দেখলেই বা, আমি কি তার কাছ থেকে কিছু আশা করছি? আসলে বাবার মুখ না দেখে তুমিই থাকতে পারবে না।

এবারে টিপ্পনীর সুরে শর্মিলা বলল, এতক্ষণে তবু কিছু বুঝেছ দেখছি। কবে যাচ্ছো?

—আমাকে কি গিয়ে তার কাছে ইন্টারভিউ দিতে হবে নাকি?

হাসি চেপে শর্মিলা জবাব দিল, তাতো দিতেই হবে।

—তার বিবেচনায় যদি ফেল করি?

—তাহলে ছাঁটাই।

খানিক গুম হয়ে থেকে মোহন বলল, তাহলে ফেল আমি করেছি ধরেই নাও।

শর্মিলা বলে উঠল, কত যে ছেলেমানুষি দেখতে হবে আরো ভবিষ্যতে কে জানে—বাবার কাছে পাস আমি তোমাকে করিয়েই

রেখেছি—হল? তা হলেও কার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে বাবা আগে একবার চোখে দেখেও নেবে না?

শোনার পরে আশ্বস্ত কিছুটা। রবিবার অর্থাৎ ছুটির দিনে সকলেরই সুবিধে। সেই দিনই যাওয়া স্থির হল। মাঝে আর চারটে দিন। কিন্তু মোহন তক্ষুণি ব্যস্ত। কোন জামা বা কোন ট্রাউজার পরে যাবে শর্মিলাকে আগে এক ফাঁকে এসে বেছে দিয়ে যেতে হবে, নইলে সাংঘাতিক মুশকিলেই পড়ে যাবে, তার স্পষ্ট কথা।

শর্মিলা ঠাট্টা করল, আমার একখানা শাড়ি নিয়ে আসব'খন তাই পরে যেও। সেই শুরু থেকে দামাল ছেলের মতো এত কাণ্ড করে এখন এত ভয় তোমার।

কিন্তু রবিবারের দু'দিন আগে থেকে শর্মিলা হঠাৎ মুশকিলে পড়ল বাবাকে নিয়ে। তাঁর ব্লাডপ্রেসার বেশি মাত্রায় চড়ে গেল হঠাৎ। একদিন তো নাক দিয়ে রক্তই পড়ল শর্মিলা বাড়িতেই তড়িঘড়ি ই. সি. জি. করিয়ে নিল। তার রিপোর্টও খুব সন্তোষজনক নয়। হার্টের অবস্থা কোনো দিনই খুব ভালো নয় তাঁর, তাই নিয়ে পরিশ্রম করেন বলে শর্মিলা এতদিন তাঁকে কড়া নজরে রেখেছিল। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, গত দু'মাস ধরে বাবার দিকে খুব একটা চোখ ছিল না তার। বাবা বেশ করে অনিয়ম করে এই কাণ্ডটি বাধিয়েছেন। সেই সঙ্গে আরো একটু অস্বস্তি শর্মিলার। এই বিয়ে নিয়েও বাবার মনে কিছুটা নাড়া-চাড়া পড়েছে, সন্দেহ নেই। খুশিতে আটখানা যে হতে পারছেন না বোঝাই যায়।

শনিবার পর্যন্তও বাবার স্বাস্থ্যের হেরফের না দেখে শর্মিলাই বলল, আমি বারণ করে দিচ্ছি, তোমার প্রেসার-টেসার কমুক, তারপর একদিন আসতে বলব, এখন তোমার বেশি কথা বলাই ঠিক হবে না।

প্রমথেশবাবু মাথা নাড়লেন। বললেন, না, আসুক। কথা বলার আর কি আছে, চোখে দেখব একটু।

দিদিদের বাবাই বলে রেখেছিলেন, তাঁর কাছে একজন আসবে, শর্মিরও খুব জানাশোনা—এলে ভালো করে যেন আদর-যত্ন করা হয়।

বাবা ভেবেছেন তাঁর এ-কথায় দিদিরা কিছু বুঝবে না। কিন্তু শোনামাত্র তারা সন্দিগ্ধ। বাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই শর্মিলাকে সতের জেরা। কে ছেলে, কেন আসবে, কি নাম। শর্মিলার সাফ জবাব, নাম ফাম অত জানি না, বাবার শরীর অসুস্থ তাই দেখতে আসছে। যাই, এবেলা আবার প্রেসারটা কেমন দেখে আসি—

এই অজুহাতে তাদের চোখের আড়াল হওয়া।

সকালে বাবা তাঁর ঘরের সামনের বারান্দায় বসেছিলেন। শুয়ে থাকার জন্য শর্মিলা অনেকবার তাগিদ দিয়েছে, কেবল যাচ্ছি যাই করছেন। সে-ও বাবার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, আর থেকে থেকে ঘড়ি দেখছিল।

একটা চকচকে স্টুডিবেকার ভিতরের বাগানের রাস্তা ধরে তিন মহলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বাবা চেয়ে আছেন। শর্মিলা আড়চোখে দেখছে। বেশ সপ্রতিভ মুখে গাড়ি থেকে নামল। বাবা থাকেন আরো একটা বৃত্তাকার ফুল বাগানের এধারে কোণের দিকের স্যুইটে। দূর থেকে বাবা আর ওকে এদিকে দেখে কি করবে ভেবে না গিয়ে গাড়ি থেকে নেমে সেখানেই দাঁড়িয়ে গেল।

শর্মিলার রাঙা মুখ : বাবার অখুশি হবার কারণ নেই। সুন্দরই লাগছে দেখতে।

প্রমথেশবাবু বললেন, তুই যা—

শর্মিলা বলল, দিদি-জামাইবাবুরা ওদিকে আছে, বসাবে'খন। তুমি ঘরে গিয়ে শোও আগে, আমি এ-ঘরেই নিয়ে আসছি একটু বাদে।

প্রমথেশবাবু আপত্তি করলেন না। আর একবার ওই গাড়ির দিকে চেয়ে দেখে নিলেন, বড় জামাই অভ্যর্থনায় এগিয়ে এসেছে।

তাঁকে শুইয়ে দিয়ে শর্মিলা তাড়াতাড়িই বেরিয়ে এলো। ওই লোককে দিদিদের খপ্পরে একলা ফেলে রাখা ঠিক নয়। অবশ্য কি বলবে না বলবে শেখানোই আছে। গম্ভীর মুখে বসার ঘরে এসে ঢুকল। তারপর শেখানোর বাইরে একটা কাজ করে বসল। দু' হাত তুলে মোহনের উদ্দেশ্যে একটা নমস্কার সারলো।

পরক্ষণেই বুঝলি, এই কাণ্ড করা ঠিক হয়নি, কারণ লোকটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে ওর দিকে চেয়ে আছে। উর্মিলা গম্ভীর মুখে জানান দিল, উনি এসেই জিজ্ঞেস করছিলেন, শর্মির বাবা কেমন আছেন। আমি বললাম, বাবার দেখাশুনা তো শর্মি করে, সে-ই ভালো বলতে পারবে।

দিদির সংশয় অন্যত্র। তেমন চেনাজানা না-হলে 'মিস' বা দেবী-টেবী বাদ দিয়ে, এমন কি শর্মিলাও না বলে একেবারে শর্মি বলে কি করে লোকটা।

শর্মিলা মনে মনে বিরক্ত, বাইরে সহজ আর একটু গম্ভীরও। চিন্তাচ্ছন্ন মুখে বলল, না, আজও তেমন ভালো নয়, ডায়স্টলিক বেশ হাই। আগেই একবার বাবাকে দেখে এলে ভালো হত না?

ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় দফা ভুল। বলল, হ্যাঁ, তাই চলো, আগে তাঁকে দেখে আসি আর প্রণাম করে আসি। বারান্দায় বসেছিলেন, তুমি হাত তুলে ডাকলেই তো আগে ওখানে চলে যেতাম।

দিদি জামাইবাবুরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। শর্মিলা হাল ছাড়ল। কত আর শাক দিয়ে মাছ চাপা দিতে পারে। আর কিছু না বলে বা কারো দিকে না চেয়ে আগে আগে ঘর থেকে বেরুলো। পিছনে মোহন। একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিল, দুই দিদি শুধু পিছনে টিমে চালে এদিকে আসছে।

অস্ফুট স্বরে শর্মিলা বলল, তুমি একটা আস্ত ইয়ে—এত করে সব বলে দিলাম—

সঙ্গে সঙ্গে এই লোকেরও চাপা রাগ। —তুমি একটা মিথ্যেবাদী —এই রকম বাড়ি তোমাদের একবারও বলেছ? বাপ! ফটক দিয়ে ঢোকার পর থেকেই আমার প্যালপিটিশন শুরু হয়ে গেছে —তারপর যেদিকে তাকাই হাঁ।

শর্মিলাকে হাসিই চাপতে হল, এখানকার সব পয়সা-অলা লোকের যেমন চার-পাঁচ বিঘে জমির মধ্যে গাছগাছড়া আর বাগান ঘেরা বিশাল একতলা বাংলো—ওদেরও তাই। বাবা আবার তার ওপর তিন বোনের জন্য পৃথক ব্যবস্থা রেখে এই বাড়ি করেছেন।

প্রমথেশবাবু তাঁর শয্যায় আধশোয়া। মোহন হাজারিকা এগিয়ে এসে তাঁর পা-ছুঁয়ে প্রণাম করল। প্রমথেশবাবু সামনের গদী-আঁটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, বোসো—।

বসল। শর্মিলা বলল, বাবার শরীর আজও খুব খারাপ। বেশি কথা বলা বারণ—

ব্যস্ত হয়ে মোহন বলে উঠল, না-না, তাহলে কথা বলার দরকারই নেই মোটে। ভাবী-শ্বশুরের শরীর খারাপের জন্য মনে মনে বোধহয় উপরঅলাকে ধন্যবাদ দিল।

প্রমথেশবাবু জিজ্ঞেস করলেন, গৌহাটিতে কতদিন যাবত আছ?

—আজ্ঞে সেই ছেলেবেলা থেকেই। এখানেই হস্টেলে থেকে স্কুল-কলেজে পড়াশুনা করেছি।

—জু-রোডে কোথায় থাকো?

এইতেই হাঁসফাঁস দশা মোহন হাজারিকার। বাবার পিছন থেকে সত্যি কথাই বলতে ইশারা করল শর্মিলা। কিন্তু দরজার ও-ধার থেকে সেটা আবার মেজদি দেখে ফেলল।

অগত্যা জু-রোডের বাড়ির নিশান দিল মোহন। তারপর বুদ্ধি

খরচ করে সবিনয়ে বলল, একটাই ঘর ওখানে, শিগগীরই ভালো দেখে একটা বাংলো দেখে নিচ্ছি।···কিন্তু আপনি আর কথা বলবেন না, নিশ্চয় কষ্ট হচ্ছে।

ভদ্রলোক অব্যাহতি দিলেন ওকে। সত্যি ক্লান্ত লাগছিল। দরজার দিকে চেয়ে মেজ মেয়েকে বললেন, ওকে নিয়ে যা, চা টা দে। মোহনকে বলল, যাও, ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলো।

মোহন হাজারিকার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। তক্ষুণি ঘর ছেড়ে বারান্দায়। প্রমীলার পিছন পিছন আবার ঝকঝকে বসার ঘরে এসে হাঁপ ফেলল।

একটু বাদে শর্মিলা এলো। মাথাব ওপর পাখা ঘুবছে বন-বন করে, কিন্তু লোকটার কপাল ঘামছে। তাকে ঘরে বসিয়ে মেজদি বেরিয়ে গেছে চায়ের ব্যবস্থা করতে। জামাইবাবুরাও ঘবে নেই। শর্মিলা আঁচ করল, ভিতরে এতক্ষণে একটা উত্তেজনার ঝড় উঠেছে। কারো আর জানতে-বুঝতে বাকি নেই কিছু। এবারে মনে মনে শর্মিলাও বেপরোয়া কিছুটা। বাবা ঠিক থাকলে আর কাউকে পরোয়া করে না।

দিদিরা আবার এলো। প্রচুর খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন। কিন্তু চায়ের আসর আর জমল না তেমন। দুই দিদিরই মুখ ঘোরালো, ধারালো। জামাইবাবুরা তো কেউ ঘরে এলোই না। অর্থাৎ ও যখন প্রথম বার বাবার ঘরে ছিল, এই লোকের পুরো নাম তখনই এদের জানা হয়ে গেছে। আর ছোট বোনের হবু বর হাজারিকা শুনেই পিত্তি জ্বলেছে সকলের। মেজদি ব্যঙ্গের সুরে ওকেই শুনিয়ে একবার বললও, মিস্টার হাজারিকা, আপনি কিছুই যে খাচ্ছেন না, বাবা শুনলে আবার আমাদেরই বলবে, তোরা আদর-যত্ন করতে পারলি না।

—না, না, তা কেন, অনেক খেয়েছি।

আসলে শর্মিলাদের এই অবস্থা দেখে ভিতরে ভিতরে সে খাবি খাচ্ছে।

একটু বাদে বিদায় নিল। কিন্তু মুখে না বললেও মন বুঝতে বাকি থাকল না শর্মিলার। ইচ্ছে, ও এখন তার সঙ্গেই চলুক। গাড়িতে তুলে দিতে এসে চাপা গলায় বলল, তোমার সঙ্গে যাওয়াটা খুব খারাপ দেখাবে, তাছাড়া আরো অসুবিধে আছে, বিকেলে বাড়ি থেকে যাব।

চলে গেল। ড্রইং রুমের দরজার কাছে ওরই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে দুই দিদি। জামাইবাবুরা যে-যার ঘরের সামনে। দুজনারই গোমড়া মুখ। তেরছা চোখে তাকিয়ে উর্মিলা বলল, এখন আমরা কিছু শুনতে পাব বোধহয়?

শর্মিলার ভিতরে মেজাজ গরম, বাইরে ঠাণ্ডা।—কি শুনতে চাও?

প্রমীলা গলা চড়ালো, আমরা জানতে চাই এ-সবের অর্থ কি?

—অর্থ তো তোমরা বেশ পরিষ্কারই বুঝেছ মনে হচ্ছে।

—বাবা তাহলে কে না-কে হাজারিকার সঙ্গে তোর বিয়ে দিচ্ছে।

—কে-না-কে নয়, জামাইবাবুদের মতোই একজন ভদ্রলোক। শিক্ষা-দীক্ষা তাদের থেকেও বেশি।

এবারে বড় বোন উর্মিলা চেঁচিয়ে উঠল, তোর লজ্জা করে না মুখ নেড়ে কথা বলতে? লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা যাচ্ছে—বাবা কি করে রাজি হল আমরা দেখে নেব না ভেবেছিস—ওই লোকের সঙ্গে আমরা একসঙ্গে এখানে থাকব?

শর্মিলা বলল, চেঁচিও না, বাবার শরীর খারাপ। তোমাদের নিশ্চিন্ত করে দিচ্ছি, তোমরা চাইলেও আমি এখানে থাকব না।

—কিন্তু বাবা কোন আক্কেলে মত দেয়?

—বাবার বুদ্ধি-বিবেচনা তোমাদের থেকে কম নয়। এই নিয়ে বাবাকে তোমরা উত্যক্ত করবে না বা বাবার ঘরে গিয়ে এ-সব কথা তুলবে না।

মেজ বোন প্রমীলা খেঁকিয়ে উঠল, তুললে তুই কি করবি?

—বাবার শরীরের কথা ভেবে আমি তোমাদের বার করে দেব।

শর্মিলা সেখান থেকে সোজা বাবার ঘরেই চলে এলো। ছোট বোনের সাহসের কথা শুনে দুই বোন স্তব্ধ। বাবাকে কতটা বশ করেছে সেটা এ-কথা থেকেই তারা বেশ অনুভব করছে।

মোহন হাজারিকা ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিল আর বার বার ঘড়ি দেখছিল। অবুঝের মতো কেবল রাগই হচ্ছে তার, কেন রাগ জানে না।

শর্মিলা আসতেই বলে উঠল, তুমি কেন আমার কাছে আগে বলোনি এ-রকম বাড়ি-ঘর তোমাদের, তোমার বাবার এত বড় অবস্থা?

শর্মিলারও মন-মেজাজ ভালো নয়। জবাব দিল, বিয়ে করতে যাচ্ছ, তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি আর একটু পাকা হওয়া দরকার।

—কেন?

—রোজ গাড়ি নিয়ে ও-ভাবে ফলো করার আগে বা অ্যাক্সিডেন্ট বাধানোর আগে, আমাদের অবস্থাটা কেমন খোঁজ নিলেই পারতে। রাগের মুখেই হেসে ফেলল, তাহলে হয়তো পর পর দু'দিন ও-রকম স্বপ্নও দেখতে না, কি বলো?

এর পরেও গোমড়া মুখ মোহনের। —এর পর সকলেই ধরে নেবে তোমার বাবার টাকার লোভে আমি এ-ভাবে তোমাদের কাছে গিয়ে ভিড়েছি।

—তোমার ভেড়াটা অপরাধ না আমার বাবার টাকা থাকাটা অপরাধ? তাছাড়া সকলে বলতে কারা ধরে নেবে?

—তোমার বোনেরা।

— আমার ভগ্নিপতিরা বাবার টাকা দেখেই ভিড়েছিল।

মাথা ঝাঁকিয়ে মোহন বলে উঠল, কিন্তু আমি তা চাই না, আমি কেবল তোমাকে চাই।

রাগ করবে কি, শর্মিলার হাসিই পাচ্ছে। বলল, তার বেশি তোমাকে দিচ্ছে কে ?

এর পর ঠাণ্ডা মাথায় সখেদেই মোহন বলল, তোমার খুব কষ্ট হবে শর্মি, আগে নিজেকে এত অযোগ্য ভাবিনি।

রাগত মুখেই শর্মিলা বলল, তাহলে বাবাকে একটা ফোন করে নাকচ করে দাও।

শুনেই ধড়ফড় করে উঠল মানুষটা।-- আমি তো তাহলে মরেই যাব।

এবারে হাসি মুখে আদরের সুরে শর্মিলা বলল, তোমার কিচ্ছু ভাবনা নেই, আমার কোনো কষ্ট হবে না। তাছাড়া তুমি নিজে ব্যবসা চালাচ্ছ, ভালো টাকা-কড়ি রোজগার করছ—নিজেকে এত ছোট ভাবার কি আছে ? আমাকে এনে কি জলে ফেলে দিচ্ছ নাকি।

অবুঝের মতো নিজের সঙ্গে অনেক বোঝার পর এবারে যেন জিতল লোকটা। খুশি। আঙুলে করে নিজের বুক দেখিয়ে বলল, জলে। আমি তোমাকে এখানকার সিংহাসনে এনে বসাবো। আমি তোমাকে যা দিতে পারব তার হিসেব টাকা দিয়ে হয় না বলে দিলাম।

শর্মিলা হাসি মুখেই ভ্রূকুটি করল।—আমি বলেছি হয় ?

এক সপ্তাহ পরে। সকাল তখন সাড়ে দশটা হবে। মোহন হাজারিকার বাড়ির কাছাকাছি মোটর মেরামতের গ্যারাজটার কাছে একটা বিলিতি ডজ গাড়ি এসে থামল। গাড়ি থেকে নেমে প্রমথেশ বরকাকুতি এ-দিক ও-দিক তাকাতে লাগলেন। তারপর গ্যারাজটার সামনে এগিয়ে এসে একজন কর্মচারীর কাছে মোহন হাজারিকার বাড়িটা কোথায় খোঁজ করলেন। লোকটা আঙুল তুলে বাড়িটা দেখিয়ে দিল। তারপর বলল, মালিক তো এখন গ্যারাজেই আছেন, ওই গাড়ির কাজ করছেন।

অদূরে একটা গাড়ি দেখিয়ে দিল।

প্রমথেশ বরকাকুতি হতভম্ব। লোকটার কিছু ভুল হচ্ছে ভেবে জিজ্ঞেস করলেন, এই গ্যারাজ কার?

- আপনি যাঁর খোঁজ করছেন, মোহন হাজারিকার।

প্রমথেশ বরকাকুতি বিমূঢ় খানিক। পায়ে পায়ে অদূরের মেরামতি গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেলেন। গাড়ির নিচে চাটাই পেতে তলায় চিৎ হয়ে শুয়ে একটা লোক কাজ করছে। মুখ দেখা যাচ্ছে না, তার নোংরা তেল-কালিমাখা পাজামা আর পা দুটো দেখা যাচ্ছে।

রইস মক্কেল ভেবে পাশের একটা ছোকরা তলার দিকে ঝুঁকে জানান দিল, বাবু, আপনাকে এক সাহেব ডাকছেন।

গাড়ির তলা থেকে সর্বাঙ্গে তেল-কালিমাখা যে-লোকটা বেরিয়ে

এলো তাকে দেখে প্রমথেশ বরকাকুতি আকাশ থেকেই পড়লেন বুঝি। এত বড় বিস্ময়ের মুখোমুখি এ-জীবনে আর বুঝি দাঁড়ান নি।

আর সামনে যে দাঁড়িয়ে তারও মাথায় আচমকা মুগুরের ঘা বুঝি।

দুজনেই নির্বাক। দুজনেই হতভম্ব।

প্রমথেশ বরকাকুতিই প্রথমে কথা বললেন।—আমি ঠিক দেখছি? তুমিই মোহন হাজারিকা?

ফ্যাল ফ্যাল করে মুখের দিকে চেয়ে থেকে মাথা নাড়ল। সেই বটে।

—এ-রকম অটো এনজিনিয়ার তুমি তাহলে?

তেমনি মাথা নাড়ল। তাই।

—আর পানবাজারে তোমার মোটর গাড়ির বিজনেস? অফিস?

মাথা নাড়ল। নেই।

রাগে মুখে রক্ত জমাট বাঁধছে প্রমথেশবাবুর মুখে। —তুমি যে এই শর্মিলা জানে?

মাথা নাড়ল। জানে না।

—তোমার বি-এস-সি পাসও এই রকমই বোধহয়?

এতক্ষণে যেন চেতনা ফিরল মোহন-এর। অস্ফুট স্বরে বলল, এক মিনিট!

তারপর প্রাণের দায়ে যেন পড়িমরি করে নিজের ঘরের দিকে ছুটল। দু মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলো। হাতে বি-এস-সি পাসের সার্টিফিকেট। সেটা বাড়িয়ে দিল।

ওটা হাতে নিয়ে দেখলেনও না প্রমথেশ বরকাকুতি। দুমড়ে মুচড়ে ওর মুখের ওপর ছুঁড়ে মারলেন। তারপর সোজা গিয়ে গাড়িতে উঠলেন। মোহন হাজারিকা বিমূঢ়ের মতো সেদিকে চেয়ে আছে। কর্মচারীরা যে তাকেই দেখছে হুঁশ নেই।

নিজের ঘরে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে মোহন হাজারিকা। পরনে সেই তেল-কালিমাখা পা-জামা, গায়ে ওই বিবর্ণ গেঞ্জি। কোথা দিয়ে একটা দেড়টা ঘণ্টা চলে গেছে জানে না। বারবার ভাবছে, শর্মিলা এখনো হয়তো হাসপাতালে আছে, সেখানে ছুটে যায়। কিন্তু মন বলছে যা হবার হয়ে গেছে। তাব আগে প্রমথেশ বরকাকুতি সেখানে মেয়ের কাছে গিয়ে পৌঁছেছেন। নিজের মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে চাইছে মোহন হাজারিকা। বলি-বলি কবেও কেন আরো সাতটা দিন দেরি কবল।

চমকে উঠে দাঁড়াল। দরজার কাছে শর্মিলা। তার দু'চোখে আগুন। মুখেরও আগুন রঙ। মোহন হাজারিকা আবার ভ্যাবাচাকা খেয়েই দাঁড়িয়ে বইল।

শর্মিলা আপাদ-মস্তক দেখে নিল তাব।—তোমার আসল পরিচয় তাহলে বেরিয়েই পড়ল।

—শর্মি—শর্মি। ব্যাকুল হয়ে এগিয়ে এসে কিছু বলতে চাইল।

—শাট্ আপ। ওই নামে তুমি আমাকে ডাকবে না। ঝলকে ঝলকে এবারে আগুনই ঝরছে শর্মিলার গলা দিয়ে।—এত ছোট এত নীচ এত বেইমান তুমি! এক-একদিন এক-একজনের মেরামতের গাড়ি হাঁকিয়ে নিজের দর দেখিয়েছ? এই জন্যেই আমাদের অবস্থা জেনে তোমার এত ভয়, এত ত্রাস?

মোহন হাজারিকা পাগলের মতোই এবার বলে উঠল, বিশ্বাস করো, বিশ্বাস করো, তোমার কাছে আসার জন্য আমি বোকার মতো কি করেছি, কি বলেছি নিজেরই ঠিক ছিল না—যা মুখে এসেছে বলে ফেলেছি, যা মনে এসেছে করে ফেলেছি। তারপর কি করে সামাল দেব ভেবে নিজের চুল টেনে ছিঁড়েছি। গত সাত দিন ধরেই আমি তোমাকে সব বলব ঠিক করে রেখেছি, কিন্তু তুমি কাছে এলে আর বলতে পারতাম না। তবু তোমাকে আমি বলতামই—

—লায়ার। স্কাউনড্রেল! বাইরের দিকে পা বাড়ালো।

মোহন হাজারিকা ছুটে এসে পথ আগলালো।—শর্মিলা, তুমি আমাকে যা-খুশি শাস্তি দাও, আমাকে ছেড়ে যেও না! আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমার এই বাইরের পরিচয়টাকে তুমি বড় করে দেখো না, তুমি আমার ভেতর দেখো। সেখানে আমি কারো থেকে ছোট নই—কারো থেকে না! দিশেহারা হয়ে আমি বোকার মতো ভুল করেছি, কিন্তু নীচ না, কপট না, বেইমান না।

কিন্তু লজ্জায় রাগে দুঃখে অপমানে মাথায় দাউ দাউ আগুন জ্বলছে শর্মিলার। এত কথার জবাবে ঠাস করে গালে এক চড় বসিয়ে দিল। সেই চড় খেয়ে নিজের অজ্ঞাতেই পথ ছেড়ে দিল মোহন হাজারিকা।

শর্মিলা চলে গেল।

কিন্তু এ-মুখই বা শর্মিলা বাড়িতে দেখাবে কি করে! দিদিরা মুখে কিছু বলছে না, কিন্তু আড়ালে আড়ালে হাসছে। বাবার কড়া নিষেধ না থাকলে সামনা-সামনি কথা শোনাতো। শর্মিলার সমস্ত গর্ব সমস্ত অহঙ্কার ধুলায় মিশেছে। কত গর্ব করে দিদিদের মুখের ওপর কথা শুনিয়েছিল, বলেছিল. যাকে বেছে নিয়েছে, জামাইবাবুদের মতোই একজন ভদ্রলোক সে, শিক্ষা-দীক্ষা তাদের থেকেও বেশি। এখন তারা হাসবে না তো কি? শর্মিলার মতো বোকা এই পৃথিবীতে আর কে আছে?

মাথায় ভিতরে আগুন জ্বলছেই, জ্বলছেই। বুকের ভিতরটাও জ্বলে যাচ্ছে। মেডিক্যাল কলেজের সতীর্থরা অনেকে আর ডক্টর ভট্টাচার্য জানে শিগগীরই একটা শুভ আমন্ত্রণ পাবে তারা। মোহন হাজারিকা এত এসেছে এখানে যে এখন আর কারো কিছু জানতে বুঝতে বাকি নেই। সে এলেই সকলে তাকে নিয়ে আনন্দ করত।

তাদের কাছেও মুখ পুড়বে শর্মিলার।

দিন পনেরো বাদে বাবা এক সন্ধ্যায় ঘরে ডাকলেন ওকে। বললেন, আমরা একটা চিটের খপ্পরে পড়েছিলাম, ভগবান রক্ষা করেছেন– তুই এত মন খারাপ করে আছিস কেন?

ঠকবাজের খপ্পরে পড়া হয়েছিল শুনেই শর্মিলার বুকের তলায় মোচড় পড়ল কেন জানে না। অথচ বাবার কথাই ঠিক। এত বড় প্রতারক আর জগতে আছে নাকি? ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন।

প্রমথেশবাবু বললেন, তোর দিদিদের ইচ্ছে তাদের কারো দেওরের সঙ্গে তোর বিয়েটা হোক। কিন্তু আমাব পছন্দ নয়। তোর কি মত?

শর্মিলা মাথা নাড়ল। তারও মত নেই।

—ভূপেন দেবশর্মা তাব ছেলের জন্য এখনো অপেক্ষা করছে। তাকে খবর দিই?

শর্মিলা মাথা নেড়ে সায় দিল। অর্থাৎ এখানে হলে আপত্তি নেই।

কিন্তু বাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বার বার কেবল মনে হতে লাগল, নিজের ফাঁসির রায়ে নিজেই সই করে এলো। আরো অনেক, অনেক কিছু যেন ভাবার ছিল। কিন্তু নিজের ওপরেই ঝলসে উঠে শর্মিলার সমস্ত ভাবনা-চিন্তা বাতিল কবার চেষ্টা।

প্রথমে ভূপেন দেবশর্মা এলেন তারপর তাঁর ছেলের যাতায়াত শুরু হল। পয়সা-অলা বাপের কেতাদুরস্ত ব্যারিস্টার ছেলে। চেহারা সুশ্রী। স্মার্ট। ভালো না লাগার কোনো কারণ নেই। ভালো যাতে লাগে শর্মিলার দিক থেকেও সে-চেষ্টার ত্রুটি নেই। অথচ সংগোপনে নিজের সঙ্গে যেন যুঝতে হচ্ছে। থেকে থেকে একটা আর্ত-মুখ চোখে ভাসে, আর্ত হাহাকার কানে আসে। শর্মিলা আবার চোখের আগুনে সেই মুখ ভস্ম করে। মনে মনে নীচ প্রবঞ্চক বেইমান বলে সেই স্বর চাপা দেয়।

বিয়ের কথাবার্তা পাকা। তারপর দিনও ঠিক। আর তিন সপ্তাহের মধ্যে যা হবার হয়ে যাবে। ডাক্তার বোন বড়লোক ব্যারিস্টারের ঘরণী হবে--দিদিদের বুকের তলায় সেই হিংসে, কিন্তু বাবার তাগিদ আর ব্যস্ততায় উৎসবের আয়োজনে মন দিতে হয়েছে।

একটা একটা করে দিন এগিয়ে আসছে। মাঝে আর বারোটি দিন। শর্মিলা নির্লিপ্ত। নিজেকে কঠিন সঙ্কল্পে বেঁধে দিন কাটাচ্ছে।

সেদিন সকালে হাসপাতালে যেতেই ডক্টর বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য নিরিবিলিতে ডেকে নিয়ে এলেন তাকে। স্বল্পভাষী গম্ভীর মানুষ, নিজের কাজে ডুবে থাকেন। এ-রকম আড়ালে ডেকে কথাবার্তা বড় একটা বলেন না।

বিনা ভনিতায় জিজ্ঞেস করলেন, শুনলাম ভূপেন দেবশর্মার ছেলে ব্যারিস্টার কুশল দেবশর্মার সঙ্গে তোমার বিয়ে?

শর্মিলা মাথা নেড়ে সায় দিল।

—কিন্তু আমরা তো জানতাম মোহন হাজারিকার সঙ্গে তোমার বিয়ে।·· তার কি হল?

শর্মিলা ঠাণ্ডা জবাব দিল, আমিই আপত্তি করেছি, তাই হল না।

ঈষৎ বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে ডক্টর ভট্টাচার্য অপেক্ষা করলেন একটু।--কিন্তু এ বিয়ে কে ঠিক করেছে, তুমি না তোমার বাবা?

—বাবা। আমি আপত্তি করিনি।

—কিন্তু কুশল দেবশর্মার সম্পর্কে তোমার বাবা ভাল্লো করে খোঁজ-খবর করে নিয়েছিলেন?

শর্মিলা সচকিত এবার।—কেন বলুন তো?

দ্বিধা কাটিয়ে ডক্টর ভট্টাচার্য বললেন, ইংল্যাণ্ডে থাকতে তাকে একটু-আধটু চিনতাম আমি। আমি যতদূর জানি একটা স্কাণ্ডালের পর সেখানে এক মেয়েকে সে বিয়ে করেছিল। তারপর তাকে ছেড়ে চলে এসেছে। যতদূর ধারণা, এই বিয়ে এখনো বাতিল হয়নি।

এখানে তোমাকে বিয়ে করলে ও কোনো দিন হয়তো বাইগেমির কেস-এ পড়বে। কবে নাগাত তার বিয়েটা হয়েছে আর সেই মেয়ের নাম কি, তাও বলে দিলেন।

ডক্টর ভট্টাচার্য চলে গেলেন। শর্মিলা নিস্পন্দ, কাঠ খানিকক্ষণ। বিশ্বাস করবে? বিশ্বাস করবে না? ডক্টর ভট্টাচার্যের মতো মানুষ নিজের কোনো অভিসন্ধিতে এমন কথা বানিয়ে বলতে পারেন? কিংবা তাঁর মারাত্মক কিছু ভুল হয়ে থাকতে পারে?

বানানো নয়, ভুল নয়—যা বলে গেলেন ডক্টর ভট্টাচার্য শর্মিলা তার সবটুকু বিশ্বাস করতে চাইছে। আশ্চর্য। আরো আশ্চর্য, এমন এক মারাত্মক খবর শুনে শর্মিলার একটুও কষ্ট হচ্ছে না, দুঃখ হচ্ছে না। উল্টে বুকের ওপর থেকে যেন দম-বন্ধ করা একটা পাথর সরে যাচ্ছে।

বাড়ি ফিরেই বাবার কাছে এলো। যা শুনে এসেছে সব বলল।

প্রমথেশ বরকাকুতির মাথায় বিনামেঘে বজ্রাঘাত যেন। অনেকক্ষণ বাদে জিজ্ঞেস করলেন, এ-সব যে সত্যি তার প্রমাণ কি?

—সত্যি না হলে তো ফুরিয়েই গেল। শর্মিলা ধীর শান্ত। —কিন্তু সত্যি কি মিথ্যে সেটা না জানার আগে এ-বিয়েতে তুমি এগোবে?

প্রমথেশবাবু মাথা নাড়লেন। তা এগোবেন না।

টাকার জোর থাকলে ইংল্যাণ্ড আর কত দূরে? তাঁদের এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বছরের বেশির ভাগ সেখানেই থাকে। এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের ফলাও ব্যবসা। সেই দিনই তাকে টেলেক্স করে কুশল দেবশর্মা আর সেখানকার সেই মেয়ের বিয়ের সম্পর্কে খবর নিতে বললেন। তাতেও সুস্থির হতে পারলেন না। বেশি রাতে সাগর পারের সেই আত্মীয়কে টেলিফোনে ধরলেন। তাঁর পাকা খবর

চাই, সে-রকম কোনো প্রমাণ হাতে পেলে কোনো এয়ার-পাইলটের সঙ্গে ব্যবস্থা করে যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। খরচ যা লাগবে তিনি দেবেন।

তিন দিনের মধ্যে প্রমাণসহ পাকা খবরই এলো প্রমথেশ বরকাকুতির হাতে। সেই বিদেশিনীর সঙ্গে কুশল দেবশর্মার বিয়ের দিন-তারিখ, বিয়ের আগে কি ঘটেছিল, এবং বিয়ের পরেব নব-দম্পতীর একটা ফোটোসুদ্ধ তাঁর জিম্মায়। বিলেতের আত্মীয় এও জানিয়েছে, সেই বিয়ে এখন পর্যন্ত বহাল আছে, মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে কুশল দেবশর্মা দেশে পালিয়ে এসেছে।

প্রমথেশবাবু গুম। ছোট মেয়েকে বললেন সব। দেখালেনও।

পরদিন সন্ধ্যায় কুশল দেবশর্মাকে বাড়িতে ডেকে পাঠালেন। ভাবী শ্বশুরের ডাক পেয়ে সে খুশি চিত্তে হাজির।

প্রমথেশবাবু বিদেশিনীর সঙ্গে পরিণযাবদ্ধ সেই ফোটোখানা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এটা আমার হাতে এসেছে, সেই সঙ্গে সব খবরও। আমার যে ক্ষতি তুমি করেছ এরপর সে-হিসেব নেবার প্রবৃত্তি নেই। তোমার বাবাকে তুমি কতটা জানাবে, বা কি ফয়সলা করবে সেটা তোমার মাথা ব্যথা। যাও!

বেত্রাহত কুকুরের মতোই ব্যারিস্টার কুশল দেবশর্মা বাইরের অন্ধকারে মিশে গেল।

প্রায় নিঃশব্দে এতবড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল দিদিরা কেউ তখনো জানে না। জানে একমাত্র শর্মিলা। আলো নিভিয়ে সে চুপচাপ তার ঘরে বসে। চোখের সামনে আর একজনের সেই আর্ত মুখ। কানে তার সেই আকুতি। —'তুমি আমাকে যা-খুশি শাস্তি দাও, আমাকে ছেড়ে যেও না। আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমার এই বাইরের পরিচয়টাকে তুমি বড় করে দেখো না, তুমি ভেতর দেখো—সেখানে আমি কারো থেকে ছোট নই—কারো থেকে না!'

চড় মেরে শর্মিলা তার গালে পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়ে দিয়েছিল।

রাতে ঘুমের মধ্যেও কতবার করে ওই এক কথাই শুনল ঠিক নেই।—'আমার এই বাইরের পরিচয়টাকে তুমি বড় করে দেখো না, তুমি আমার ভেতর দেখো!' যত বার ঘুম ভেঙেছে ততোবার মনে হয়েছে, বাইরের পরিচয় যার বড় করে দেখা হয়েছিল, সেই কুশল দেবশর্মার ভেতরটা কি ভীষণ বীভৎস, কুৎসিত। ঈশ্বর এ ভাবে তাকে হাতে ধরে রক্ষা করলেন কেন? কি উদ্দেশ্যে?

পরদিন।

হাসপাতালের সময় ধরে গাড়ি নিয়ে বেরুলো শর্মিলা। শিলং রোড ধরেই আসছে। কিন্তু জু-রোডের মোড়ে এসে গাড়ি আর সোজা এগলো না। বাঁক নিয়ে জু-রোডে ঢুকে গেল।

সেই গ্যারাজের সামনে সে নেই, কেউ নেই, গ্যারাজ বন্ধ।

গাড়ি থেকে নেমে পায়ে পায়ে মোহন হাজারিকার ঘরে এলো। এখানেও ঘরের দরজায় বাইরে থেকে তালা ঝুলছে।

শর্মিলার বুকে হাতুড়ির ঘা পড়তে থাকল। গ্যারাজের দিকেই এগলো এবার। অদূরের কোণের দিকে একটা লোক খাটিয়ায় বসে। এখানকারই দরোয়ান-টরোয়ান হবে। শর্মিলা তার কাছে গিয়ে খোঁজ করল, গ্যারাজের মালিক বা ওই ঘরের মালিক কোথায়।

লোকটা জানালো, মালিক এক মাস আগেই গ্যারাজ আর তার ঘরে তালা লটকে দেশে চলে গেছে। সম্প্রতি মালিক তাকে চিঠি দিয়েছে, ওই ঘর আর গ্যারাজ কেনার মতো খদ্দের মেলে কিনা দেখতে—পেলে তক্ষুণি তাকে জানাতে।

শর্মিলা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, চিঠিতে ঠিকানা আছে? দেশ কোথায়?

ঠিকানা জানাই আছে লোকটার। দেশ ফকিরা গ্রামে।

গৌহাটি থেকে পশ্চিমে গেলে ষাট মাইল পথ।

এই লোকের কাছে মোহন হাজারিকার দেশের বাড়ির হদিসও পেয়ে গেল শর্মিলা। সে একবার মালিকের দেশের বাড়িতে গেছল। ফিরে এসে আবার হাসপাতালের দিকেই গাড়ি ছোটালো। তার আগে হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটা দেখে নিয়েছিল। ব্যাগে টাকা বেশি নেই, কিন্তু টাকা হাসপাতালে গেলেই পাবে। তার এ-মাসের মাইনেটাই এখনো নেওয়া হয়নি। মাইনে-টাইনের কথা গত পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে মনেও পড়েনি।

প্রথমেই ডক্টর ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করে তাকে ধন্যবাদ জানালো। তার হাতেই পনেরো দিনের একটা ছুটির দরখাস্ত দিল। মুখের দিকে চেয়ে ডক্টর ভট্টাচার্য আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। শর্মিলা নিজের জায়গায় এসে বাবার নামে ছোট্ট চিঠি লিখল একটা। —'ঈশ্বর তাকে এবারই দয়া করেছে, আগের বারে নয়। আভিজাত্যের খোলসের মোহ আর আমার নেই বাবা, ভুল করে যাকে সকলে মিলে আমরা আঘাত দিয়েছি (আমিই সব থেকে বেশি), তার কাছেই যাচ্ছি। আমাকে ক্ষমা করো।'

চিঠি খামে বন্ধ করে একজন বেয়ারাকে বলল, বাড়ি গিয়ে বাবার হাতে দিতে। তারপর মাইনের টাকা নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ল।

সঙ্কল্প স্থির। মনে আর কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্বের লেশমাত্র নেই।

বেলা বারোটার মধ্যেই ফকিরা গ্রামে পৌঁছে গেল। তারপর একে-ওকে জিজ্ঞেস করে যথাস্থানে।

অনেকগুলো মাটির ঘর। তার মাঝখানে উঠোন। একটা ঘরের সামনের দাওয়ায় মোড়ার ওপর চুপচাপ বসেছিল মোহন হাজারিকা। পরনে লুঙ্গি। আদুর গা। গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। মাথায় কত দিনের মধ্যে তেলজল পড়েনি ঠিক নেই।

শর্মিলার চেনা গাড়িটা একেবারে কাছে এসে দাঁড়াতে চমক ভাঙলো।

তারপর নিজের এই দুটো চোখকে বিশ্বাস করবে কি করবে না সেই সংশয়।

গাড়ি থেকে নেমে শর্মিলা কাছে এসে দাঁড়াল। চেয়ে আছে। দেখছে।

লোকটা বিমূঢ়। বিহ্বল।

শর্মিলা খুব সহজভাবেই বলল, বাঃ, খাসা চেহারাখানা করেছ!

সঙ্গে সঙ্গে একটা অভিমান বুক নিংড়ে ঠেলে বেরুলো বুঝি।

—আমার চেহারা যা-ই হোক, তুমি এখানে কেন?

কি বলতে গিয়ে শর্মিলা ঘুরে দাঁড়াল। গ্রাম দেশের এই বাড়িতে একটা মেয়েকে অমন চকচকে গাড়ি চালিয়ে এসে হাজির হতে দেখে নানা বয়েসের কতগুলো ছেলে-মেয়ে ছুটে এসেছে, আর হাঁ করে তাকেই দেখছে। এদিক-সেদিকে তেমনি বিস্মিত কয়েকটি বয়স্ক মুখও দেখা গেল।

তার দিকে ফিরে শর্মিলা বলল, এখানে যে দেখতেই পাচ্ছ, এখন সকলের সামনে তোমার অপমান করাব ইচ্ছে নাকি?

মোহনের মাথায় তখনো ভালো করে কিছু ঢুকছে না। শুধু অভিমান কুরে খাচ্ছে তাকে। আগে আগে ঘরে ঢুকল। পিছনে শর্মিলা।

আগের কথার জের ধরে গজগজ করে মোহন হাজারিকা বলে উঠল, আমরা গরিব, অপমান আমরা করব কেন, তোমাদের অঢেল টাকা, অপমান করার একচেটে অধিকার শুধু তোমাদের!

হঠাৎ সব ভুলে মজাই পেয়ে গেল শর্মিলা। ভেতরটা যার এত ছেলেমানুষ, তার কাছে ঘটা করে ক্ষমা চাইবে কি। অবাক মুখ করে জিজ্ঞেস করল, আমি আবার তোমাকে কি অপমান করলাম?

—নীচ কপট বেইমান বলে চড় মেরে চলে গেছ—আবার এসেছ কেন? আরো কিছু বাকি আছে?

শর্মিলা চকিতে একবার পিছনে দেখে নিল। ছেলেমেয়েগুলো এখনো উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। হাত বাড়িয়ে দরজাটা টেনে দিল। তারপর কাছে এসে গাল পেতে দিল, তুমিও একটা চড় মারো।

এক মাসের ওপর আত্মঘাতী যন্ত্রণার মধ্যে ডুবে আছে যে মানুষ, শর্মিলাকে দেখা মাত্র তার পক্ষে এতবড় রহস্যের হদিস পাওয়াও সহজ নয়। কিন্তু এবারে পেল। তবু বিশ্বাস করবে কি করবে না, সেই সংশয়, সেই ভয়।

তার পরেই চড় মারার বদলে যা শুরু করে দিল, তার ধকল সামলাতে শর্মিলা নাজেহাল।

গ্রামের ওই বাড়িতেই বিয়ে হয়ে গেল।

এমন সাদামাটা বিয়ে কখনো চোখে দেখা দূরে থাক, শর্মিলার কল্পনার মধ্যেও ছিল না। কিন্তু তার জন্য এতটুকু খেদ নেই, ক্ষোভও নেই। বরং গতানুগতিকতার বাইরে ভারী মজাদার নতুন কিছু হল যেন। গ্রামের এই পরিবেশে এমন বিয়েই মানায়। এর বেশি জাঁকজমক করতে গেলে সেটাই কৃত্রিম হত।

মোহন হাজারিকার এই গ্রামের বাড়িতে এক বুড়োবুড়ি থাকে। আত্মীয় কিছু নয়। বাড়ি-ঘর জমিজমা তারাই দেখাশুনা করে। উদ্যোগী হয়ে গ্রামের অন্তরঙ্গদের ডেকে তারাই বিয়ে দিল।

মুশকিল দাঁড়াল তার পর। শর্মিলার পনেরো দিনের ছুটি ফুরিয়ে আসছে। কিন্তু মোহন তার কোনো কথা কানে তুলতেই রাজি

নয়। আবার গৌহাটি ফিরে যেতে তার ভীষণ আপত্তি। আর ভয়ের কারণগুলো শর্মিলা আঁচ করতে পারে। বিয়ের পরেও বড়লোক শ্বশুর এবং তার মেয়েরা তার বউকে না কেড়ে নেয়। গৌহাটি গিয়ে ওই শ্বশুরের মুখোমুখি দাঁড়ানোর কথা ভাবতে তার কাঁপুনি। কেড়ে না নিলেও আস্তে আস্তে ছোট মেয়ের কান-মন বিষিয়ে দিতে পারে। ওই অঢেল ঐশ্বর্যের পাশাপাশি বউ নিয়ে বাস করতে তার ভয়, দ্বিধা, সঙ্কোচ। তার থেকে এই গ্রামে থেকে গেলে তার রাজার মেজাজ। এখানেই বউকে সে বাঁধী করে রাখতে চায়।

বিয়ের আগে শর্মিলা যা অনুভব করত, বিয়ের পরের এই ক'দিনের মধ্যে এই লোকের সেই ছবিটাই অতি বাস্তব হয়ে তার সামনে উপস্থিত। সেই কারণে একটা চিন-চিন অস্বস্তি মনের তলায় উঁকিঝুঁকি দিলেও সেটা একেবারে ছেঁটে নির্মূল করে দেওয়ার চেষ্টা। তার কল্পনায় যে পুরুষ ছিল এই লোকের সঙ্গে তা মেলে না, মিলবে আশাও করেনি। বিদ্যায় বুদ্ধিতে চালচলনে কোন শিক্ষিত আর মরমী মেয়ে স্বামীকে নিজের থেকে বড় করে দেখতে চায়। কিন্তু যাকে সে যেচে এসে গ্রহণ করল, তার ভিতরের সবটুকু যেন এক ছেলেমানুষের গণ্ডীর মধ্যে আটক আছে। তার হাসিখুশি আনন্দ রাগ অভিমান সবই যেন ছেলেমানুষের। জীবনে হিসেবের দিকটা তার কাছ থেকে দূরে সরে আছে। বুকের তলার সমস্ত স্নেহ উজাড় করে ঢেলে দেবার মতো সে একটি মানুষ পেয়েছে, তাকে রাগিয়ে হাসিয়ে আদর করে অস্থির করার মতো বুকের কাছেরই একজনকে পেয়েছে—কিন্তু স্বামী পেয়েছে মন-প্রাণ দিয়ে ভাবতে গেলে কিছু ঘাটতি না পড়ে পারে না। শর্মিলা ভাবতে চায় না। বিয়ের সঙ্গে একটি বয়স্ক ছেলেমানুষকে গ্রহণ করার দায়িত্বও সে হাসি মুখেই বহন করতে প্রস্তুত।

অতএব বেগ পেতে হলেও ডাক্তারী ছেড়ে এখানে কেন তার

পক্ষে বসে থাকা সম্ভব নয়, সেটা বুঝিয়ে ছাড়ল। অভয় দিল তার স্বাধীনতায় কেউ কোনোদিন হাত দেবে না। গৌহাটিতে সে আগে যেমন ছিল তেমনি থাকবে। তার চালু মোটর গ্যারাজ বন্ধ করার কোনো দরকার নেই। বরং আরো সেটা বড় করে তোলা যায় কি করে দুজনে মিলেই ভাববে। যে যা-ই ভাবুক, তার কাজকে শর্মিলা কোনোদিন ছোট করে দেখবে না, এই প্রতিশ্রুতি দিল। ছোট ভাবলে সে কি তার কাছে আসত?

মোহন হাজারিকা শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছে। মন বেঁধেছে।

শর্মিলার গাড়িতেই দুজনে রওনা হয়েছে আবার। কিন্তু গৌহাটির যতো কাছে এসেছে, মোহনের মুখ তত, বিমর্ষ আবার। ওই মুখ দেখে শর্মিলার হাসিই পেয়েছে।

গৌহাটিতে এসে গাড়ি চাঁদমারীর রাস্তা ধরতে মোহন আঁতকে উঠেছে আবার। কিছুতেই আগে সে শ্বশুর বাড়িতে যাবে না। আগে নিজের ঘরে গিয়ে ওঠা হোক। সেখান থেকে খবর পাঠানো হবে। তারপর শ্বশুর যদি ডাকেন, তখন যাওয়া যাবে।

শর্মিলা কথায় কান না দিয়ে বাড়ির রাস্তায়ই চলল। বলল, আগে সেখানে গেলে কি হবে, বাবা আর দিদিরা তোমার কাছ থেকে আমাকে কেড়ে রেখে দেবে?

—তা না দিক, অপমান তো করতে পারে!

—পারে না, করবেই হয়তো! কিন্তু তাতে তোমার আমার গায়ে লাগবে কেন, তুমি কি ভাবো কোনো অন্যায় করেছ?

মাথা ঝাঁকিয়ে মোহন জবাব দিল, না, কখনো না।

—তাহলে?

—তাহলে সেধে অপমান হতে যাব কেন?

—বাবার আশীর্বাদ নিতে যাওয়া আমাদের কর্তব্য, তাই যাব। অপমান যদি করেনও, তাই মাথায় করে চলে আসব। আর তুমিও

বুঝতে পারবে. তোমার জন্যেই কতটা আমি ছেড়ে আসতে পেরেছি।

বাবা সেই বাইরের বারান্দায় বসে। দিদিরা আর ভগ্নিপতিরাও ওই গাড়ি দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। তাদের ছেলে-মেয়েগুলোও।

গাড়ি থেকে নেমে শর্মিলা মোহনকে বাইরের ঘরে বসতে বলল। তারপর কারো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সোজা বাবার দিকে এগিয়ে গেল। শর্মিলার বুকের তলায় খচখচ করে উঠল। এই ক'দিনে বাবা যেন আধখানা হয়ে গেছে। গাল ভাঙা, চোখ বসা।

কাছাকাছি আসতে প্রমথেশবাবু একটা হাত তুলে ওকে আর এগুতে নিষেধ করলেন। থমথমে মুখ।

শর্মিলা হাত দশেক দূরে দাঁড়িয়ে গেল।

প্রমথেশবাবু বধূ বেশে মেয়েকে দেখলেন। কপালে আর সিঁথিতে সিঁদুর। গাঁয়ের বউয়ের মতো হাতে লাল পলার চুড়ি।

শর্মিলা জিজ্ঞেস করল, প্রণাম করতে দেবে না ··আশীর্বাদও করবে না?

দিদিরা আর ছেলেমেয়েরা পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। দিদিদের ঘোরালো মুখ, ধারালো চাউনি। ছেলেমেয়েগুলো সশঙ্ক।

প্রমথেশবাবুর দুই চোখে আগুন। গলার স্বরে ব্যঙ্গ।—শুধু এটুকুই চাই, আর কিছু চাই না?

শান্ত মুখে শর্মিলা জবাব দিল, না।

প্রমথেশবাবু আবার খানিক চেয়ে থেকে বললেন, তার আগে একটা খবর জেনে রাখা ভালো। আমি একটা উইল করেছি, সই-সাবুদও হয়ে গেছে। এটা করার কেন দরকার হয়েছে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না বোধহয়?

—না। আমাদের শুধু প্রণাম করে যেতে দাও আর আশীর্বাদ করো। এর বেশি আর কিছু আমরা চাই না।

যে প্রভূত বিত্ত সমস্ত জীবন ধরে প্রমথেশবাবু সঞ্চয় করেছেন,

তার থেকে বঞ্চিত হওয়াটা ছোট মেয়ে এমন স্থির শান্তভাবে মেনে নেবে—এতটা বোধহয় তিনি ভাবেন নি। ভিতরে ভিতরে আরো যেন ক্ষিপ্ত তিনি।—আমাদের বা আমরাটা কে—তোর সঙ্গের ওই মোটর মেকানিক?

—হ্যাঁ, তোমার সে কেউ নয়। আমার স্বামী। সে সেধে আমার কাছে আসেনি, আমি তার কাছে গেছি। তোমাকে প্রণাম করে আর আশীর্বাদ নিয়ে আমরা চলে যাব। তাকে অপমান করে নিজের মেয়ের কাছে তুমি ছোট হতে পারো না বাবা।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে রইলেন প্রমথেশবাবু। তারপর বললেন, আচ্ছা, ডাক।

দিদির বড় ছেলেটা ছুটে গিয়ে তাকে ধরে নিয়ে এলো। মোহনের বিড়ম্বিত হাসি-হাসি মুখ। কাছে এসে শ্বশুরের পায়ে হাত রেখে প্রণাম করল, দিদিদেরও প্রণাম করতে গেল। তারা পিছিয়ে গেল। শর্মিলা বাবার পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করল।

প্রমথেশবাবুর ধকধকে চাউনি ছোট জামাইয়ের মুখের ওপর। বললেন, আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব, আমার মেয়ে কেড়ে নেবার অভিশাপ যেন তোমার গায়ে না লাগে। আর কিছু বলার নেই, এবার যেতে পারো।

তাড়াতাড়ি পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা মোহনের। শর্মিলা বাধা দিল, দাঁড়াও। দিদিদের দিকে ফিরল, বাবাকে এর মধ্যে কোনো ডাক্তার দেখেছে?

ঊর্মিলা মাথা নাড়ল। কোনো ডাক্তার দেখানো হয়নি। বলল, আমরা খোঁজ নিলে বাবা বলেন, ভালো আছেন ডাক্তার দরকার নেই।

অসহিষ্ণু ঝাঁঝে ছোট মেয়েকেই প্রমথেশবাবু বললেন, সে খোঁজেও আর তোমার দরকার নেই, তুমি এখন যেতে পারো। তোমার জিনিসপত্র বা বইপত্র আমি কাল সব লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেব।

শর্মিলা সামান্য হেসে জবাব দিল, জিনিসপত্র সব তোমার দেওয়া, এরপর আর সে-সব পাঠানোর দরকার নেই। বইপত্রগুলো অবশ্য কাজে লাগবে।

নিজের ঘরে ঢুকে গেল। বাবা-মায়েব ফোটো আর ব্ল্যাড-প্রেসারের যন্ত্রটা হাতে করে তক্ষুণি ফিরল আবার। ফোটোটা দিদিদের দেখিয়ে বলল, এটা আমার তোলা, নিয়ে যাচ্ছি। তারপর বাবার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, অনেক দিন প্রেসার চেক করা হয়নি, একবাব দেখে যাব?

প্রমথেশবাবুর বুকের তলায় কিছু যেন দুমড়ে মুচড়ে ভাঙছে। অনেক শক্ত, অনেক কঠিন হবেন ভেবে রেখেছিলেন। ক্রোধে ক্ষোভে দিশেহারার মতো দিন কাটাচ্ছিলেন তিনি। এই মেয়েকে আব ক্ষমা করার মতো কোনো দুর্বলতা মনের কোণে ঠাঁই দেননি। চূড়ান্ত আঘাত দিয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির প্রতীক্ষায় ছিলেন তিনি। কিন্তু ভিতরে যে কান্নার ঢেউ জমাট বেঁধেছিল তার খবর রাখতেন না। মেয়ের এই শান্ত সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে তাতে ভাঙন ধরল। উল্টে নিজেকেই নৃশংস অপরাধী মনে হতে লাগল।

মুখের দিকে আর তাকাতেও পারলেন না। অন্যদিকে মুখ ফেরালেন।

বাবার এই ভিতরটাকেই সব থেকে ভালো চেনে শর্মিলা। এগিয়ে চেয়ারটা টেনে সামনে বসল। হাসছে অল্প অল্প। প্রেসার মাপার যন্ত্রটা তাঁর ইজিচেয়ারের হাতলের ওপর রেখে তিন মিনিটের মধ্যে প্রেসার দেখা শেষ করল। বলল, খুব বেশি না হলেও কিছু বেশি। দিদিদের দিকে ফিরল। এর পর আর আমার এসে এসে বাবাকে দেখে যাওয়াটা বোধহয় তোমাদের পছন্দ হবে না, ডক্টর ভট্টাচার্যকে বলে রাখব, তিনি মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবেন—তাঁকে ফী দিও।

ছোট ছেলের মতোই অভিমানে ফেটে পড়লেন প্রমথেশবাবু।

—আমি খুব ভালো আছি, আমাকে দেখার জন্যে কারো আসার দরকার নেই।

বাবার মুখের দিকে চেয়ে যেন ভেতর দেখতে পাচ্ছে শর্মিলা। হেসেই বলল, কিন্তু আমি এলে যে দিদিদের সন্দেহ হবে আবার তোমাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে কিছু আদায়ের মতলবে আছি।

বড় দুই মেয়ের দিকে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অন্যদিকে মুখ ফেরালেন প্রমথেশবাবু। সেই চাউনিতে শুধু রাগ নয়, ঘৃণাও। দিদিদের এতটা বরদাস্ত হল না। ঊর্মিলা এবার চাপা ঝাঁঝে বলে উঠল, এতবড় একটা কলঙ্ক বাঁধিয়ে বাবার মুখ পোড়ালি আবার আমাদের ঠেস দিয়ে কথা বলতে তোর লজ্জা করছে না? তোর জন্যে বাইরে পর্যন্ত মুখ দেখাতে পারি না আমরা এখন—

শর্মিলা ঠাণ্ডা জবাব দিল, পারবে। আমার অংশ যখন তোমাদের ভাগে আসছে তখন হাসি মুখই দেখাতে পারবে।·· বাবার মেয়ে হয়ে এই মন তোমাদের, তার মুখ কে পোড়াচ্ছে আয়নায় ভালো করে দেখগে যাও—

প্রমীলা চেঁচিয়ে উঠল, বাবা। ও আমাদের অপমান করছে - তুমি কিছু বলবে না?

বেদনা-বিবর্ণ মুখে প্রমথেশবাবু ছোট মেয়েকেই বললেন, তুই এবার যা শর্মি—

শর্মিলা আর একবার বাবার মুখখানা দেখল ভালো করে। তারপর আস্তে আস্তে ফিরে চলল। কিন্তু দু-পা এগিয়ে চাঁপা রংয়ের ফিয়েট গাড়িটার দিকে চোখ পড়তে আবারও কি'মনে পড়ল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বাবাকে বলল, গাড়িটা এখন নিয়ে যাচ্ছি—বিকেলের মধ্যে পাঠিয়ে দেব—

এবারে প্রমথেশবাবু যেন আর্তনাদ করে উঠলেন।—ওই গাড়ি তোর, তোর মা নিজের টাকায় ওই গাড়ি তোকে কিনে দিয়ে গেছল —না রাখতে চাস তো ব্রহ্মপুত্রের জলে ফেলে দেগে যা!

রাগ শর্মিলারও হতে পারত। মায়ের অনুরোধে বাবাই এই গাড়ি কিনে দিয়েছিলেন। টাকাটা মায়ের নিজের কিনা বা বড় মেয়েদের শোনাবার জন্য বাবা এই কথা বললেন কিনা জানে না। তবু সবকিছু থেকে বঞ্চিত হবার পর একটা গাড়ির প্রত্যাশা কে রাখে। কিন্তু বাবার মুখের দিকে চেয়ে শর্মিলার সে কথা আর মুখে এলো না। ধীর পায়ে ফিরে চলল।

একটা ঘরের মধ্যে নতুন সংসার গুছিয়ে বসতে কত আর সময় লাগবে। বড় বাংলো ভাড়া নেবার জন্য মোহন ব্যস্ত হয়ে উঠছিল শর্মিলা বাধা দিয়েছে। বাংলো ভাড়া নেবার আর দরকার নেই। সময় মতো পাশে আর একটা ঘর তুলে নিলেই হবে। রোগী দেখার জন্য একটা ঘর তার দরকার বটে। আপাতত সে কাছাকাছির মধ্যে কোথাও একটা ঘর ভাড়া নেবে। উপার্জন তো বাড়াতেই হবে।

রোজগার বাড়ানোর চেষ্টায় মোহনও উঠে-পড়ে লেগেছে। এখন তার ফুর্তি যেমন, উৎসাহও তেমনি। গ্যারাজ খুলে পুরনো লোকজন আবার সব ডেকে এনেছে কাঁচা টাকা হাতে এলেই ওতে ঢালছে। গ্যারাজ বাড়াতে হবে, বড় করতে হবে। এখন রাতারাতি বড়লোক হবার নেশা তার। কিন্তু খরচের বেলায় হাতের পাঁচ আঙুল ফাঁক। বউয়ের জন্য বেশি খরচ করতে পারলেই আনন্দ। দশ টাকায় যা হয়ে যায় তার জন্য বিশ টাকা খরচ করে বসে। শর্মিলা কিছু বললে বা রাগ করলে অমনি অভিমান। গর্বিত বলে তার এটুকু খরচের হাত বাড়াবাড়ি ভাবে বউ। এতদিন গ্যারাজ বন্ধ ছিল। তাই টাকারও টানাটানি। বেহিসেবী হবার ফলে এক-একসময় আবার এমন হয় যে, গাড়ি মেরামতের টুকটাক জিনিস কেনারও টাকা হাতে থাকে না। তখন আবার মাথা চুলকে শর্মিলার কাছেই এসে দাঁড়ায়। —একটু অসুবিধেয় পড়ে গেছি, কিছু টাকা দিতে পারো।

শর্মিলা হাসে। টাকা দেয়ও। কিন্তু উপদেশ দিতে গেলেই বাবুর সেটা অসহ্য।

শর্মিলার সমস্ত সমাচার হাসপাতালের একজনই শুধু জানে। ডক্টর বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। দরদী মানুষ, কিন্তু বাইরে কোনো প্রকাশ নেই। মুখ ফুটে কারো ভিতরের কথা জানতেও চায় না। বাবাকে মাঝে মাঝে বাড়ি গিয়ে দেখে আসার জন্য অনুরোধ করার সময় এই একজনকেই শর্মিলা সব কথা বলেছে। শুনে ডক্টর ভট্টাচার্য মুখে কিছু বলেননি, মুখের দিকে চেয়ে ওর মনের জোরটাই শুধু দেখেছেন। বলেছেন, ভেব না, উপার্জন তুমি নিজেই যথেষ্ট করতে পারবে। তবে বছর দেড় দুই একটু পরিশ্রম করে এম-ডি-টা করে নিলে ভালো হয়।

শর্মিলারও সেই রকমই সঙ্কল্প। ডক্টর ভট্টাচার্য নিজেই দেখে শুনে ওর জন্য একটা চেম্বার ঠিক করে দিলেন। আর মেয়েদের কেস পেলেই ওর কাছে পাঠাতে লাগলেন। কিন্তু নতুন জীবনের এই নিবিষ্টতায় বাদ সাধছে কেবল ঘরের একজন। অবুঝের মতো তার সাফ কথা, সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত তুমি তোমার কাজ নিয়ে থাকবে আর আমি আমার। কিন্তু সন্ধ্যের পর থেকে কারো নো-কাজ নট-কিচ্ছু। শুধু তুমি আর আমি আর আমি আর তুমি।

বোঝালেও যখন বুঝতে চায় না, শর্মিলা রাগ দেখায়। বিকেলে তো ছ'টা থেকে আটটা চেম্বার। তাছাড়া আবার একটা পরীক্ষা দেবার তালে আছি, রাতে কিছু পড়াশুনা না করলে চলবে? সকালটা তো হাসপাতালের চাকরিতেই কেটে যায়।

কিন্তু কার কথা কে শোনে। রাগ করবে, অভিমান করবে, আর হাতের কাজ শেষ হলেই চেম্বারে এসে হানা দেবে। অগত্যা বাধ্য হয়েই শর্মিলা বিকেল পাঁচটা থেকে সাতটা চেম্বার আওয়ার করে নিয়েছে। আর রাতেও ওই অবুঝকে আদর করে ঘুম পাড়িয়ে রাখার পর টেবিল ল্যাম্প জেলে বইপত্র খুলে বসার অবকাশ।

আরো একটা দায়ও নিজের হাতে তুলে নিতে হয়েছে। পরীক্ষা দেওয়া বা স্থিতি হয়ে বসাব দু-তিন বছরের মধ্যে দুজনার এই ছোট্ট সংসারে আর কোনো আগন্তুক কাম্য নয়। মুখে বলেওছে সে-কথা। আর সে-ও অম্লানবদনে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিয়েছে। বলেছে, শুধু তুমি আর আমি, আপাতত কেন, কোনদিনও আর কেউ না এলে আমাব আপত্তি নেই। কিন্তু নিরিবিলির সেই সান্নিধ্যে এলে সতর্ক হবার সব দায় যেন শুধু শর্মিলার। ওই লোক তখন যেমন অবাধ্য তেমনি অবুঝ। এই দেহতটে বাসনার ঢেউ যথেচ্ছ ভেঙে পড়বেই—সামলাতে হয় তুমি সামলাও।

অগত্যা সমস্ত সতর্কতার দায়িত্বও শর্মিলারই। লোকটা তারপব অঘোবে ঘুমিয়ে পড়ে। সমস্ত দিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রম, তার ওপর কোন-বকম চিন্তা-ভাবনার জট নেই মাথায়। ঘুম স্বাভাবিক। টেবিল ল্যাম্পের আলোয় বই খুলে শর্মিলা মাঝে মাঝে ওই ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

সময় সময় হাসি পায়। বিয়ে করে সে স্বামী পেল নাকি স্বামীর আকারে একটা ছেলে পেল। অবকাশ সময় কেবল বাবার জন্য মনটা ভারী ছটফট করে। দু'মাসের ওপর হয়ে গেল তাঁকে চোখেব দেখাও দেখেনি। সেদিন আবার ডক্টর ভট্টাচার্য বললেন, তোমাব বাবার প্রেসারটা এখন ঘন ঘন ফ্লাকচুয়েট করছে। মানসিক অশান্তি বেড়েই চলেছে বোঝা যায়।

··মুখ ফুটে মেয়ের কথা কিছু জিজ্ঞেস করেন না শুনল। কিন্তু ডক্টর ভট্টাচার্য শর্মিলার সম্পর্কে কিছু বললে নাকি শোয়া থেকে সোজা হয়ে বসেন আর উদ্‌গ্রীব হয়ে শোনেন। তাঁকে দেখতে গেলে ইচ্ছে করেই ডক্টর ভট্টাচার্য শর্মিলার প্রসঙ্গ তোলেন। সে-যে খুব ভালো আছে, আর দিনে দিনে তার পসারও বাড়ছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এ-কথাও বলেন। বাবার মুখখানা তখন নাকি শান্তিতে ভরে যায়।

শর্মিলা কি করবে ভেবে পায় না। হাসপাতাল থেকে টেলিফোন করতে পারে। কিন্তু বাবা এখন আর কাজকর্ম দেখেন না, আপিসেও যান না। ফোন করতে হলে বাড়িতেই করতে হয়। তাহলে দিদিরা বা ভগ্নিপতিদের কেউ ফোন ধরবে। দিদিদেরই ধরার সম্ভাবনা বেশি। বাবার প্রতি দরদ বা টানটা তারা কখনোই সাদা চোখে দেখবে না, সন্দেহ করাটা রোগে দাঁড়িয়েছে ওদের। কথা কইতেও রুচিতে বাধে শর্মিলার।

সকাল আটটার মধ্যে চা আর ভারী জলখাবারের পাট সেরে মোহন গ্যারাজে চলে যায়। বেলা একটার আগে তার আর ফুরসত নেই। তাকে কাজে পাঠিয়ে স্নান সেরে ধীরে সুস্থে হাস-পাতালে রওনা হবার জন্যে তৈরি হয় শর্মিলা। সেদিনও মোহন চলে যেতে চুপচাপ জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল শর্মিলা। একটু বাদেই চমকে উঠল। বাবার মস্ত বিলিতি গাড়িটা ঘরের গায়ে এসে থামল।

গাড়ি থেকে প্রমথেশবাবু নামছেন!

শর্মিলা ছুটে এলো। দু'হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, এই শরীর নিয়ে বাবা তুমি কেন এলে? হাসপাতালে একটা ফোন করলেই তো আমি ছুটে যেতাম।

বাবার মুখ আরো শুকনো, কিন্তু লালচে। চোখ দুটো আগের থেকেও বসা। ওর হাত ছাড়িয়ে গাড়ি থেকে বেশ বড়-সড় একটা পুঁটলি বার করলেন। তারপর বললেন, ঘরে চল—

শর্মিলা সন্ত্রস্ত। পুঁটলিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, এতে কি বাবা?

রাগত মুখে তিনি বলে উঠলেন, এখানে দাঁড়িয়েই কথা বলবি? ঘরে ঢুকতে দিবিনে?

আনন্দে উত্তেজনায় বুকের ভিতরটা কাঁপছে শর্মিলার। তাড়াতাড়ি দু'হাতে তাঁর একটা হাত ধরল।—চলো বাবা, চলো। ওই মস্ত

পুঁটলিটা বাবার হাত থেকে নিলে বাবার সুবিধে হত, কিন্তু কেন যেন শর্মিলা তা পাবল না।

ঘরে এনে বাবাকে শয্যায় বসালো। ঘবেব চাবদিক একবার দেখে নিয়ে হতাশ গলায তিনি বলে উঠলেন, এখনো এই একটা ঘবেই তোকে ফেলে বেখেছে—কেন, বড় বাড়ি ভাডা নেবে বলে খুব ডম্ফাই কবেছিল না ?

বাবাকে ঠাণ্ডা কবার মতোই নবম সুবে শর্মিলা বলল, নিতে চেয়েছিল বাবা, আমিই আপত্তি কবেছি, গ্যাবাজটা চোখেব ওপব থাকে, তাতে সুবিধে। তাছাড়া বিশ্বাস কবো, আমি খুব ভালো আছি বাবা, এ আমাব আর একটা তপস্যা, তুমি কেবল আমাকে আশীর্বাদ কবো।

কিন্তু তবু খুশি করা গেল না। তপ্ত স্বরে জিজ্ঞেস কবলেন, স্কাউনড্রেলটা কোথায় ?

—গ্যারাজে। ডাকব ?

- যাক, আমি আব ওব মুখ দেখতে চাই না।

শর্মিলা হেসে ফেলল, সেটা কি আমাব কাছে আনন্দেব কথা হবে বাবা ? আমার ভালো চাইলে তাব ভালো না চেয়ে তুমি পারো ?

একটু গুম হয়ে থেকে প্রমথেশবাবু বললেন, থাক, যাবাব সময় দেখা কবে যাব'খন। সামনেব পুঁটলিটা দেখিয়ে বললেন, আমাব সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়েছিস, তোর জিনিস আব আমি রাখব কেন—এগুলো তোর।

সম্পর্ক কে ছেড়েছে শর্মিলা সে কথা আর তুলল না। ওই পুঁটলির দিকে চেয়ে অস্বস্তি।—ওতে কি আছে ?

—তোর মায়ের গয়না। তোর দিদিদের ভাগ তারা বিয়েব পরেই বুঝে নিয়েছে—তোরটা আমাব কাছে ছিল।

ছিল যে শর্মিলা জানে। ছোট মেয়ে বলে তার ভাগটা সব

থেকে বড়ই ছিল তাও জানে। কম করে দেড়শ ভরি সোনার গয়না মা তার জন্যে পৃথক করে রেখেছিল। হাতে টাকা এলেই গয়না গড়িয়ে রাখত। আঠারো বছর বয়স হতে ওর জন্য নতুনও কত গড়িয়ে রেখেছিল ঠিক নেই। দিদিরা এ জন্য মা-বাবা দুজনকেই কম ঠেস দিত না, কম কথা শোনাতো না।

বুকের তলা থেকে একটা যন্ত্রণা ঠেলে উঠল শর্মিলার। বলল, বাবা, এ তুমি কেন নিয়ে এলে, এ আমি কি করে নেব?

প্রমথেশবাবু সঙ্গে সঙ্গে তেতে উঠলেন। গাড়ির প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন, ঠিক সেই কথাই আবার।—না নিতে পারিস ব্রহ্মপুত্রের জলে ফেলে দে–যা খুশি কর। তোর মা নিজের জিনিস যাকে যা দিয়ে গেছে—সেসব সঙ্গে নিয়ে আমি স্বর্গে যাব? আমি কি কারো কাছ থেকে চুরি করে এনেছি এগুলো? ব্যাঙ্কের লকারে ছিল, কাল তুলে এনে ঘরে রেখেছি, আর আজ তোর দিদিদের বলে তাদের চোখের সামনেই নিয়ে এসেছি। এরপর তোর মায়ের জিনিসও ফিরিয়ে দিয়ে আমাকে অপমান করবি? কাঁদাবি?

শর্মিলা এগিয়ে এসে তার গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, ঠিক আছে বাবা, নেব। তুমি একটু ঠাণ্ডা হও—

—ওঃ। ঠাণ্ডা হও—আমার জন্য কত দরদ। দু'মাসের মধ্যে একবার দেখতে এলি না কেন? বেঁচে আছি কি মরে গেছি খবর নিলি না কেন?

হেসে ফেলে শর্মিলা এবারও বাবাকে ঠাণ্ডাই করতে চাইল। বলল, খবর ঠিকই নিয়েছি, আচ্ছা এবার থেকে প্রায়ই গিয়ে তোমাকে দেখে আসব, আর তোমার চিকিৎসার ভারও আমিই নেব।

প্রমথেশবাবু রাগ ভুলে এবারে যথার্থ ভেঙে পড়লেন। মেয়ের দুটো হাত ধরে বলে উঠলেন, শুধু ভার নিলে হবে না, আমার ভুল শুধরাবার সুযোগ তোকে দিতে হবে। তোর দিদিদের আর জামাইবাবুদের আমি বলে দিয়েছি, ওই উইল আমি ছিঁড়ে ফেলব।

যা আছে তার কড়াক্রান্তি সমান তিন ভাগ হবে, তোরটা তোকে বুঝিয়ে দিতে হবে। সেই থেকে ওরা আমাকে কি বেঁধা বিঁধছে তুই জানিস না শমি। আগে যা করেছি ওদের ভয়ে আর জ্বালায় করেছি। এখনো ওদের জন্যেই সর্বদা আমার ভয়, ওরা আমাকে মেরে ফেলতেও পারে—বিশ্বাস করে আমি ওদের হাতে খেতে পর্যন্ত পারি না।

শর্মিলা স্তব্ধ খানিকক্ষণ। বাবাব এমন বিশীর্ণ বিভ্রান্ত মূর্তি আব বুঝি দেখে নি। বলল, বাবা তুমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছ, তোমার টাকা আর সম্পত্তির লোভ ওদের আছে জানি, কিন্তু এত খারাপ ওরা নয়।

এতেই তাঁব উত্তেজনা বাড়ল।—আমার মিথ্যে ভয় হতে পারে, কিন্তু তোকে ওরা ঠকাতে চায় কি বলে? পাছে তোকে কিছু দিয়ে ফেলি সেই ভয়ে জামাই দুটো অন্তত আমার চোখ বোজার অপেক্ষায় আছে জেনে রাখ। কিন্তু আমি তা বরদাস্ত করব বলতে চাস, চোখ বোজার আগেই তোকে যাতে ঠকতে না হয় সে ব্যবস্থা আমি করে যাব।

আবারও গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে শর্মিলা তাঁকে ঠাণ্ডা করল। তারপর খুব অনুনয়েব সুরে বলল, বাবা, একটা কথা বলব তুমি রাগ করবে না?

—না রে না, আর তোর কোনো কথাতেই আমি রাগ করব না। কিন্তু আমি যা করতে যাচ্ছি তুই তাতে বাধা দিবি না।

—কিন্তু আমার পরামর্শ যদি নাও তুমি তাহলে এখন কিছুই করবে না বাবা। তাহলে ও-বাড়ি যেতে আর তোমার চিকিৎসা করতে আমার অসুবিধে হবে। আর তোমারও গঞ্জনা বাড়বে। ও যেমন আছে, থাক এখন। তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠো, তারপর যা খুশি কোরো, তখন আমি কিছু বলব না।

প্রমথেশবাবু আর কিছু বলতে পারলেন না। মুখের দিকে চেয়ে

রইলেন। চোখে জল।

কিন্তু সময় যে তাঁর সত্যি ঘনিয়েছে শর্মিলা ভাবতে পারে নি। ভাবতে চায় নি। পনের দিন না যেতে বড় রকমের স্ট্রোক হয়ে গেল। সেই ধাক্কা আর সামলানো গেল না। বাহাত্তর ঘণ্টা অজ্ঞানের মতো থেকেছেন। সেই অবস্থায়ই প্রাণপণে যুঝেছেন। আর শর্মিলা মৃত্যুর হাত থেকে বাবাকে তেমনি করে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছে। তিন-চারদিনের মধ্যে নাইতে খেতেও সময় পায় নি। শহরের সমস্ত বড় ডাক্তারকে বাবার শয্যার পাশে নিযে এসেছে। ডক্টর ভট্টাচার্যও এ ক'দিন ওই বাড়িতেই থেকে গেছেন।

মাঝে মাঝে বড় বড় চোখ করে বাবা তাকিয়েছেন। শর্মিলাকেই খুঁজেছেন। সে ঝুঁকলে কিছু যেন বলতে চেয়েছেন। কিন্তু বলতে পারেন নি। সকাতরে দুই মেয়ের দিকেও তাকিয়েছেন। তাদেরও বলা কিছু হয় নি। কিন্তু শর্মিলার ধারণা, বাবা কি বলতে চায় দিদিরা তা বুঝেছে।

প্রমথেশ বরকাকুতি চোখ বুজলেন। উর্মিলা প্রমীলা তারস্বরে কাঁদল। কাঁদতে পারল না শুধু শর্মিলা।

বাবার কাজ পর্যন্ত এই বাড়িতেই মুখ বুজে থেকে গেল শর্মিলা। পারলৌকিক কাজের আগে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে বাবা যেন ব্যথা পাবেন। কিন্তু ঘরের ওই অবুঝ একজনের তাতেও আপত্তি। রোজই তাকে নিয়ে যাবার জন্যে এসে ধর্না দেয়। শর্মিলা শক্ত মুখেই তাকে ফেরায়। আর দিদিদের মুখ দেখে ধারণা, তারা ভাবছে বাবার টাকাকড়ি বা সম্পত্তি কিছু পাবে কি পাবে না—ছোট বোন সেই আশায় বসে আছে। কি করা যেতে পারে না পারে দুই বোন এই নিয়ে শলা-পরামর্শও হয়তো করে।

বাবার কাজ ঘটা করেই হয়ে গেল। বাবারই টাকা, গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজো। আর সেই দিনই রাতে শর্মিলা ঘরে যাবার জন্য প্রস্তুত হল।

দিদিরা দুজনেই এসে বাধা দিল. আর দু'চারদিন থেকে যা, আজই যাওয়ার কি দরকার ?

শর্মিলা জবাব দিল, আর থাকলে তোমাদের ভাগাভাগির অসুবিধে হবে। এরপরে তো সেই পালা—সেটা আর দেখার ইচ্ছে নেই।

বুদ্ধিমতী দিদিরা এখন আর তার ওপর রাগ করল না। পাল্টা করে বলল, আমাদের কি দোষ বল, এমন কাণ্ড করলি তুই, বাবাই তো রেগেমেগে উইল করে বসল—এখন তোর ভগ্নিপতিদের বোঝানো মুশকিল।...যাই হোক, বাবা নিশ্চয় তোকে অনেকটাই ক্ষমা করে গেছেন, নইলে মায়ের গয়নাপত্র সব তোকে দিয়ে আসবেন কেন। আর উইল বদলাবার কথাও দুই-একবার আমাদের কাছে বলেছিলেন, টাকাকড়ি কিছু তোকে হয়তো দিয়ে যেতে চেয়েছেন—নগদ যা আছে সেটা সমান তিন ভাগ করতে আমাদের আপত্তি নেই। আপনার জন হয়ে মাথা খারাপের মতো এমন একটা কাজ করে ফেললি কি আর বলব।

শর্মিলা ঠাণ্ডা জবাব দিল, আর বেশি বোলো না দিদিরা, এরপর হয়তো হেসে ফেলব, তোমাদের উদারতা আমার মনে থাকবে। ভাগাভাগি যা করার নিজেদের মধ্যেই করে নাও। আর তারপর বাবার কাছেই রোজ প্রার্থনা করো. যে ব্যবহার তোমরা তাঁর সঙ্গে করেছ তেমনি যেন ছেলেমেয়ের কাছে তোমাদের পেতে না হয়। আর আমাকে যে-রকম আপনার জন ভাবো, সে-রকম আপনার জন ভাই-বোনদের তোমাদের ছেলেমেয়েরা যেন না ভাবে।...চলি।

বাপের বাড়ির সঙ্গে যোগ সেই শেষ।

দিন মাস বছর গড়িয়েছে আবার। শর্মিলার প্র্যাকটিস বেড়েছে, চাকরিতেও কিছু উন্নতি হয়েছে। কিন্তু এ-রকম উন্নতি বা হঠাৎ

এভাবে প্র্যাকটিস বাড়া শর্মিলার কাম্য ছিল না আদৌ। হাসপাতালে বা বাইরের জীবনে একমাত্র আপনার জন ছিলেন ডক্টর বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। লম্বা ছুটি নিয়ে ভদ্রলোক আবার বিদেশে পাড়ি দিলেন। সরকারী যোগসূত্রে আপাতত দু-বছরের জন্য বিদেশের কোনো বড় হাসপাতালে কাজের ভার নিয়ে চলে গেলেন। দেশে ফিরলেও এরপর এই হাসপাতালের সঙ্গেই যোগাযোগ থাকবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। যাবার আগে ভদ্রলোক তদবির-তদারক করে শর্মিলাকে তাঁর জায়গায় বসিয়ে গেলেন। শুধু তাই নয়, তাঁরই সুপারিশে তাঁর বাঁধা রোগীরাও প্রয়োজনে এখন ওরই শরণাপন্ন। এত পরিশ্রমের মধ্যেও এম-ডি পরীক্ষা দেওয়ার সঙ্কল্প মাথায় আছে।

কিন্তু জীবনের সব কিছু ওলটপালট হয়ে যাবার মতো আবার একটা অঘটন সামনে মুখব্যাদান করে আছে, ভাববে কি করে।

সর্বব্যাপারে এখনো ছোট ছেলের মতোই ঘরের লোককে ভোলাতে হয়, সামলাতে হয়। তার উৎসাহ ফুর্তি রাগ আর অবুঝপনা ঠিক তেমনই আছে। আর একটা ঘর হয়েছে, গ্যারাজও আগের থেকে বড় হয়েছে। কিন্তু তাতে মন উঠছে না। আরো অনেক টাকা চাই। আর সে-কারণে এবার দেশের বাড়ি বিক্রী করার ঝোঁক। পেট্রল পাম্প-এর পারমিটের ব্যবস্থা প্রায় করেই এনেছে। পেলে এখানেই আরো কিছু জমি নিয়ে পেট্রল পাম্প হবে। আর একটা মোটর সার্ভিসিংয়ের ইউনিটও চালু করা যাবে তখন। শর্মিলা নিজের গয়না বার করে দিতে চেয়েছিল। বলেছিল, ও তো অকারেই পড়ে আছে, টাকার সত্যি তেমন দরকার থাকলে নিয়ে নাও। যা আছে তাতে তোমার পেট্রল পাম্প, সার্ভিসিং ইউনিট সবই হয়ে যাবে।

শোনামাত্র বারুদের মুখে আগুন। —বউয়ের গয়না বেচে সে বড় হওয়ার রাস্তা করবে? বউ এতবড় অপদার্থ ভাবে তাকে?

রাগারাগি করে সে-বেলার মতো ঘর ছেড়েই চলে গেল। দুপুরে অনেক সাধ্য-সাধনার পর খাবার জন্য ধরে আনা গেল।

অগত্যা এর পর ভেবে চিন্তে দেশের বাড়ি-ঘর পুকুর জমা-জমি বিক্রীর ব্যাপারে মত দিতে হল। সমস্যার কথা যা বলছে তা মিথ্যে নয়। দেখাশুনার অভাবে সব জঙ্গল হয়ে যাচ্ছে। তার ওপর দিন-কাল যা, কেউ উড়ে এসে জুড়ে বসলেই হল। বিপাকে পড়লে সব রক্ষা করা সেই বুড়োবুড়ির কর্ম নয় এর মধ্যে লোক মারফৎ অনেকবার জানিয়েছে, আর তারা পেরে উঠছে না, ক্ষেতের ফসল বা পুকুরের মাছ সবই চুরি হয়ে যাচ্ছে। এরপর বাড়িঘরের হালও ভালো নয়, ভেঙে ভেঙে পড়ছে।

এদিকে ঠিক এই সময়েই জমির দাম সর্বত্র হু-হু করে বাড়ছে। শহরের বড়লোকেরা অনেকেই চড়া দামে বাইরে জমি কিনছে, ঘর-বাড়ি তুলছে। একটু চেষ্টা করলেই মোহন হাজারিকাও এই মওকায় ভালো টাকা ঘরে তুলতে পারে। দু-পাঁচজনের সঙ্গে যোগাযোগও করেছে। ওই দেশের বাড়িতে আর যখন থাকাই হচ্ছে না, তখন এই সুযোগে কেন বেচে দেবো না? এদিকের ব্যবসার জন্য যে টাকা দরকার সব ওই এক জায়গা থেকেই উঠে আসবে।

এ-রকম শোনার পর আর বাধা দেওয়ারও কোনো মানে হয় না। পনের দিনের মধ্যেই দেশের ঘর-বাড়ি জমি-জমা সব এক সঙ্গে বিক্রীর ব্যবস্থা পাকা করে ফেলল। এ-সব কাজে উৎসাহ বা তৎপরতার কোনো অভাব নেই। যা ভাবে তা করতেও সময় লাগে না।

লেখা-পড়া লেন-দেন শেষ। টাকাও সব হাতে এসেছে এবং ব্যাঙ্কে জমা পড়েছে। এর আগে বার কয়েক ফকিরা গ্রামে যেতে হয়েছে। কাজ শেষ হবার পর নতুন মালিককে সব বুঝিয়ে দিয়ে নিজের মায়ের স্মৃতি সেখানে যা পড়ে আছে সে-সব নিয়ে আসার

জন্যে শেষ বারের মতো আবার ফকিরা গ্রামে গেছে। আগামীকাল ফেরার কথা।

দামাল ছেলের ঘর ছেড়ে অন্যত্র গেলে মায়ের যেমন চিন্তা, এই লোকও একলা বাইরে বেরুলে সেই গোছের দুশ্চিন্তা হয় শর্মিলার। কালকের পরে নিশ্চিন্ত। আর যাওয়ার দরকার হবে না।

পরদিনও নিশ্চিন্ত মনেই হাসপাতালে এসেছে। মোহনের ট্রেন বেলা সাড়ে দশটা নাগাত গৌহাটি স্টেশনে পৌছুবে। ফিরে এলে স্টেশন থেকে ফোন করে, নয়তো সোজা হাসপাতালে চলে আসে। শর্মিলাকে একদিন না দেখলে ছটফটানি। কাজের চাপে ঘড়ির দিকে চোখ ছিল না শর্মিলার। সরকারি দপ্তর থেকে একটা জরুরি খবর এলো। খবরটা শুনে শরীরের রক্ত জল হবার দাখিল শর্মিলার। বেলা তখন বারোটা।

গৌহাটি থেকে পনের মাইলের মধ্যে ওমুক ডাউন ট্রেনের সঙ্গে একটা গুডস ট্রেনের মুখোমুখি অ্যাক্সিডেণ্ট। ডাউন ট্রেনটা লেট ছিল। সিগন্যালের গোলযোগে দিনের আলোয় এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা। চার-পাঁচটা বগি চূর্ণ-বিচূর্ণ, হতাহতের সংখ্যাও বিপুল। হাস-পাতালের কর্তৃপক্ষ যেন প্রস্তুত থাকে, প্রচুর আহত মানুষকে জায়গা দিতে হবে।

ওই ডাইন ট্রেনেই মোহনের ফেরার কথা।

স্টেশনে ফোন করে শর্মিলা দুর্ঘটনার সঠিক জায়গা জেনে নিল। তারপর দিশেহারার মতো সেই পথে গাড়ি ছোটালো।

এ-রকম বিভীষিকা শর্মিলা আর জীবনে দেখেনি।

এ-যেন সত্যি নয়। এ-যেন সত্তা পাথর করে দেওয়ার মতো দুঃস্বপ্ন একটা। এখানে মৃত্যুর উৎসব, ছেঁড়া-খোঁড়া থেঁতলানো মানুষের দেহের নরক, আর্তনাদে বাতাস ভরাট। অনেক সেবা-প্রতিষ্ঠান একযোগে মৃত এবং আহত দেহ উদ্ধার করে চলেছে।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বাদে তার সন্ধান মিলল। একটা ভাঙা

বগির তলা থেকে তাকেও টেনে বার করা হল। তার বুকে একটা আট-ন'মাসের শিশু। শিশুর গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত পড়ে নি। সে ওই লোকের বুকেব নিচে থেকে তাবস্বরে কাঁদছে। মানুষটা যেন কাত হয়ে শুয়ে দুই হাতে আর বুক দিযে আগলে রেখেছে তাকে।

মানুষটাকে চিত করার আগেই শর্মিলা তাকে চিনেছে। ভিতর থেকে একটা নাড়ি-ছেঁড়া আর্তনাদ ঠেলে বেবিযেছে, কিন্তু গলা দিয়ে এতটুকু শব্দ বেরোয় নি। মোহনের মাথার চুল কেবল রক্তে ভেজা, শরীবের আব কোথাও আঘাতের চিহ্ন নেই।

বড় আশা নিযে শর্মিলা ঝাঁপিয়ে পড়ে তার পালস দেখল, হাত চাপা দিয়ে বুক দেখল। যা মনে হল, বিশ্বাস না কবে স্টেথো কানে লাগিয়ে দেখল।

না, দেখার আব কিছু নেই। এই মানুষ আর কোনদিন চোখ তাকাবে না, কোনদিন কথা বলবে না, কোনদিন আর মাটিব বাতাস টানবে না। কিন্তু এই মুখের দিকে চেয়ে শর্মিলা কি তা বিশ্বাস করবে? যেন দুষ্টুমি করে চোখ বুঁজে আছে, আর ঠোঁটের কোণে একটু মজার হাসি লেগে আছে।

ফোটোগ্রাফাররা আগেই মৃতের বুকে জীবিত শিশুসহ ফোটো তুলে নিয়েছিল। তারপর কোনো সেবিকা ওই শিশুকে তুলে নিয়েছে শর্মিলা দেখেও নি। মোহনকে স্বামী বলে সনাক্ত করার পর সেই সেবিকা এগিয়ে এসে বাচ্চাটাকে তাড়াতাড়ি শর্মিলার কোলে দিয়ে দিল। মোহনের পাশেই মাটির ওপর নিস্পন্দ কাঠের মতো বসেছিল শর্মিলা। বাচ্চাটাকে কোলে দেবার পরেও তার কোনো হুঁশ নেই। সেই অবস্থাতেও এদিক-ওদিক থেকে কয়েকটা ফোটো তোলা হয়ে গেল। কাঁদতে কাঁদতে শিশুটার গলা ভেঙে গেছে। কিন্তু এই কোলে এসে সে-ও যেন আপনার জন পেল। শর্মিলার মুখের দিকে একবার তাকিয়েই কান্না থামিয়ে হেসে উঠল

আর বুকে ওঠার জন্য হাত-পা ছুঁড়তে লাগল।

বিচার-বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণের পরিবেশ সেটা নয়। সকলেই ধরে নিয়েছে ওই শিশু তাদেরই সন্তান।

শর্মিলা কাউকে কিছু বলতে পারে নি। ফুটফুটে শিশুটিকে বুকে চেপে ধরেছে। মোহন কোথাকার শিশু এভাবে তার বুকে তুলে দিয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারছে না। সেই সেবিকাটি কোথা থেকে একটা দুধের বোতল সংগ্রহ করে তার হাতে দিল। মুখের কাছে ধরতেই খাবার জন্য বাচ্চাটার সে কি ব্যাকুলতা।

ওই শিশুকে বুকে নিয়ে শর্মিলা প্রায় বিকেল পর্যন্ত ছিল সেখানে। ভলানটিয়ারদের নিজের পরিচয় দিয়ে জানিয়েছে, এ-ছেলে তার নয়। ছেলের বাবা বা মায়ের সন্ধানের চেষ্টা হয়েছে। সেই বগি থেকে অনেক মেয়ে পুরুষের বিকৃত বিধ্বস্ত মৃতদেহ বার করা হয়েছে। আহত মানুষদের আগেই সরানো হয়েছিল। কিন্তু বিকেল পর্যন্ত কোনো মেয়ে বা পুরুষ এই শিশুর সন্ধান করল না।

শর্মিলার পরিচয় পাওয়ার পর কেউ আর শিশুটিকে আপাতত তার জিম্মায় ছেড়ে দিতে আপত্তি করল না। শর্মিলার বাইরেটা পাথর। কিন্তু অতক্ষণ পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে সেও এই শিশুর বাবা মায়ের হদিস পেতে চেষ্টা করেছে। তার অনুরোধে মোহনের দেহ আরো অনেক হতাহতের সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে গৌহাটি হাসপাতালে পাঠানো হল। আশ্চর্য, শর্মিলা ওই শিশুকে পাশে কখনো শুইয়ে কখনো বা বসিয়ে এক হাতে তাকে আগলে অন্য হাতে তার গাড়ি চালাচ্ছে। শোকের প্রশ্ন নেই। শোকও পাথর।

আপনজন বলতে আর কেউ থাকল না। দিদিদের একটা খবরও দেয় নি শর্মিলা। কি করে নিজেরাই খবর পেয়ে এসেছিল। বাচ্চাটাকে দেখে তারা হাঁ। তাকে কোনো আশ্রম-টাশ্রমে পাঠিয়ে দিয়ে বোনকে তারা তাদের কাছে চলে আসতে পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু শর্মিলা তাদের কাছেও কোন রকম শোক প্রকাশ করে নি।

তারা এখন আসবে, ডাকবে জানা কথা। ডাক্তার বোন, উপার্জন ভালো, একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট ঝাড়া হাত-পা এখন। তাদের কাছে থাকলে এখন আর উপকার ছাড়া অপকার কিছু নেই। অতএব বোনের কাছে কোথাকার অজানা ঘরের এক আট-ন' মাসের শিশু দেখলে তারা এছাড়া আর কি পরামর্শ দেবে? নিজের দিদিদের এত-গুলো করে ছেলেপুলে থাকতে অন্যের ছেলের ভার নেবার কি দবকার?

শর্মিলা হ্যাঁ-না কিছুই বলে নি। কি করবে তাও না। মনেব এই অবস্থায় পরের ছেলের ভার বইবার সঙ্কল্প কিছু ছিল না। প্রাথমিক কর্তব্য যা তাই করেছে। বাচ্চাটার গলায় খুব সরু একটা চেন হাব ছিল। তাতে পুরনো আমলের একটা বড় গিনিব লকেট ছিল। ওতে বড় ইংবেজি হরপে শুধু 'ডি' অক্ষর খোদাই করা। সেই হার আর লকেট খুলে শিশুটির ফোটো তুলে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। যদি কেউ সাড়া দেয়, যদি আপনারজন কেউ কোথাও থেকে থাকে। লকেট আর হার তখন প্রমাণের বিষয় হবে। কেউ খোঁজ করে নি।

কিন্তু দু' মাস না যেতে শর্মিলার মনে হয়েছে, এরপর খোঁজ যদি কেউ করে, কোনো দাবিদার যদি এসে দাঁড়ায়—ওব বুকের আর একখানা হাড় খসে যাবে। ওই দুটো ছোট কচি হাত যখন তাকে আঁকড়ে ধরে, মুখের দিকে চেয়ে খিল খিল করে হাসে—শর্মিলার মনে হয় বুঝি পাগল হয়ে যাবে। কাজে মন দিতে পারে না, বাইরের প্র্যাকটিসে মন দিতে পারে না। বাইরে বেরুলেই ছুটে এসে ওই শিশুকে বুকে চেপে ধরতে ইচ্ছে করে। এই এক জীবন্ত ননীর পুতুল কি জিনিস তা কি এমন করে কখনো অনুভব করেছে? দিদিদের বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছে, কিন্তু এ-ও জানত তারা কেউ ওর নয়। এ-ও নিজের নয়। কিন্তু এই শিশু তাকে মাতৃত্বের স্বাদ বুঝিয়ে দিয়েছে। শর্মিলার বুকের তলায়

হাহাকার। উপার্জনের তাগিদে, আরো উঁচু ডিগ্রীর মোহে মা হবার সম্ভাবনাকেই সে সবার আগে তফাতে রেখেছে। আরো একটা কারণে নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে তার। কেন ওই শিশুর ছবি দিয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে গেল ? দু' মাস কেটে গেছে বটে, কিন্তু এখনো যে কেউ এসে হাজির হবে না, ঠিক ঠিক প্রমাণ দাখিল করে ওই শিশুর ওপর দাবি জানাবে না— কে বলতে পারে ? রাতের ঘুমের মধ্যেও এই দুঃস্বপ্ন দেখে শর্মিলা।

স্বামী ঠিক নয়, বুকের স্নেহ উজাড় করে দেবার মতো এক ছেলেমানুষ এসেছিল তার জীবনে। সে নিজে থাকল না। ওকে জব্দ করার জন্যেই যেন কার এক শিশুকে দু' হাতে বুকে আগলে দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করে শর্মিলাকে উপহার দিয়ে গেল। এ ও যেন তার মজার ছেলেমানুষি—কিছু। কিন্তু এই উপহার সে আর এ-জীবনে বুক থেকে নামাবে কি করে ? নামানোর কথা মনে হলে বুকের তলার যে জায়গা দুমড়ে-মুচড়ে একাকার হয়ে যায়—সেটা কোনোদিন সত্যি হলে ও বাঁচবে কেমন করে ? বাঁচবে কি নিয়ে ?

এই ত্রাসের কথা মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারে না। কিন্তু একজন হয়তো কিছুটা আঁচ করতে পারে। তার নাম পার্বতী চেটিয়া। ওই শিশুকে ঘরে আনার প্রথম দিন থেকেই শর্মিলা তাকে বাড়িতে বহাল করেছিল।

পার্বতী গারো অর্থাৎ মেঘালয়ের মেয়ে। সেটা একাত্তর সাল। দু' বছর আগে খাসি জয়ন্তিয়া আর গারো মিলে মেঘালয় হয়েছে। বছর পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বয়েস। উঁচু, লম্বা, মজবুত স্বাস্থ্য। মোটা-মুটি সুশ্রী। ভদ্রঘরের মেয়ে, ভদ্রঘরে বিয়েও হয়েছিল। স্বামী অকালে মারা গেছে। লেখাপড়া কিছু শিখেছিল, কিন্তু চাকরি-বাকরি জোটার মতো কিছু নয়। বড় দুই ভাইয়ের গলগ্রহ হয়ে ছিল। কিন্তু সেভাবে থাকতে রাজি নয়। কাজের জন্ম নানা

জায়গায় ছোটাছুটি করেছে। বেশির ভাগই আয়ার কাজ। এক বছর দেড় বছরের মেয়াদে এক একবার কাজ পেয়েছে। সে-কাজ আবার চলেও গেছে।

শেষের দু'বছর ভাইদের কাছে ছিল। কোনো কাজ জোটে নি। শেষে দূর সম্পর্কের কোনো আত্মীয়কে ধরে গৌহাটি চলে এসেছিল। এখানে সরকারী বে-সরকারী অনেক হাসপাতাল আছে। যদি এ-রকম কোনো জায়গায় পাকা কাজ জোটে। গত ছ'মাস ধরে সে হাসপাতালে শর্মিলার পিছনে লেগে ছিল। মেয়েটাকে পছন্দ করত শর্মিলা। হাসপাতালে বার কয়েক ছুট কাজে লাগিয়েছে ওকে। কথা কম বলে, মন দিয়ে কাজ করে। কিন্তু ওর বরাত এমনি খারাপ, পাকা কাজ আর হয় না।

না হওয়ার বিশেষ কারণ, পায়ের খুঁত। সাত্-আট বছর আগে একটা পা কি করে জখম হয়েছিল। জখম সেরেছে, কিন্তু সেই থেকে একটু খুঁড়িয়ে চলে। সরকারি হাসপাতালে মাইনে-করা আয়ার এ-রকম খুঁত থাকলে চাকরি হওয়া শক্ত। তার ওপর বয়েসও অন্তরায়। হাসপাতালে পয়সাঅলা রোগী বা রোগিণী ক্যাবিন ভাড়া নিলে অনেক সময় নিজের খরচে আয়া রাখে। শর্মিলা এতদিন পার্বতীকে সেই রকম কাজ জুটিয়ে দিয়ে আসছিল। কোনো সপ্তাহে বেকার বসে থাকত, কোনো সপ্তাহে বা কাজ জুটত।

শিশুটিকে নিয়ে দুর্ঘটনার জায়গা থেকে সোজা হাসপাতালে এসেছিল শর্মিলা। কারণ মোহন হাজারিকার দেহ পোস্টমর্টেমের জন্য সেখানেই আনা হয়েছে। এদিকে দেখাশোনার জন্য ছেলেটাকে ওই প্রথম দিনই পার্বতীর হাতে দিয়েছিল। সে তখন বেকার বসে।

তারপর বিকেলে শিশুর সঙ্গে ওকেও সঙ্গে করে ঘরে ফিরেছে। তখন কিছু ভাবার শক্তি নেই শর্মিলার। যে ক'দিন-না কোনো ব্যবস্থা হয় ওই শিশুকে আগলানোর জন্যেও একজনকে দরকার। পার্বতীর থেকে বিচক্ষণ আর বিশ্বস্ত কাকে পাবে?

সেই থেকে পার্বতী চেটিয়া শর্মিলার কাছেই আছে। হাসপাতালের পাকা আয়ার গোড়ায় যে মাইনে শর্মিলা তাকে সেই টাকাই দেয়। খাওয়া-থাকার খরচ ধরলে আরো ঢের বেশিই দেয়। পার্বতী চেটিয়া মুখে কিছু প্রকাশ করে না, ভিতরে ভিতরে এই একজনের কাছে তার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

শর্মিলার থেকে বয়সে আট-ন' বছরের বড়, বাড়ির কাজ নেবার পর থেকে তাকে বহীনজি বলে ডাকে পার্বতী। ছেলেটা মাঝে থাকার দরুন দু'জনে আরো কাছাকাছি এসেছে। ওর মুখে আর ডক্টর হাজারিকা বা মিসেস হাজারিকা শুনতে ভালো লাগে না। পার্বতী তার বহীনজির আতঙ্ক অনুভব করতে পারে। একই কারণে পার্বতীর একটু ভয়। ওই কুড়িয়ে পাওয়া ছেলের সঙ্গে তারও স্বার্থের যোগ। কোনো দাবিদার এসে হাজির হলে ও-তো আবার সেই বেকার। বহীনজিকে যে-রকম চিনেছে, এই ছেলে থেকে গেলে ওরই বাকি জীবন থেকে অনিশ্চয়তার ছায়া সরে যাবে। প্রথম থেকেই বহীনজিকে ভালো লেগেছে, কিন্তু সে যে এত উদার আর এত স্নেহপ্রবণ, জানা ছিল না।

শর্মিলা ছেলের নাম রেখেছে বাবুল। পার্বতীকে বার বার বলে রেখেছে, কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে হোক বা যে কারণেই হোক, কোনো অপরিচিত মানুষ যদি খবর নিতে আসে, ও যেন একটি কথাও না বলে বা বাবুলকে সামনে না আনে। সবার আগে তাকে টেলিফোন করতে হবে। হাসপাতাল বা চেম্বারের ব্যস্ততার মধ্যেও দু-তিন বার বাড়িতে ফোন করে বাবুল কি করছে না করছে খবর নেয়। গ্যারাজ বেচে দিয়ে শর্মিলা টেলিফোনটা শুধু বাড়িতে তুলে এনেছিল।

দু' মাস কেটেছে। শর্মিলার মনে হয়, আরো একটা দুটো মাস কেটে গেলে নিশ্চিন্ত। তখন আর কেউ খোঁজ করবে না—কাগজের

বিজ্ঞাপন আরো অনেক তলিয়ে যাবে। কিন্তু পরের একটা দুটো মাস কাটার পরেও মানসিক আতঙ্কের ছায়া তেমনিই আছে। বরং কেউ কোনদিন ছেলে চাইতে আসার সম্ভাবনা মনে এলে বুকের ভিতরটা আগের থেকেও বেশি ছাঁৎ করে ওঠে। বাবুল এখন টল-টলে হাঁটে, ভাঙা-ভাঙা অজস্র কথা বলে, শর্মিলা বাইরে থেকে ঘরে ফিরলে মা-ম্মা-মা-ম্মা বলে দু' হাত তুলে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। গালে বুকে মুখ ঘষে মা-কে আদর করে।

বেঁচে থাকার এখন একটাই অর্থ, একটাই লক্ষ্য। ওই ছেলে। হাতে বিত্ত বা টাকাকড়ি এখন কম নয় শর্মিলার। মায়ের দেওয়া সেই রাশীকৃত গয়না ব্যাঙ্কের লকারে পড়ে আছে। মোহনের দেশের বাড়ি আর জমি-জমার টাকা, আর গ্যারাজ বিক্রীর টাকা ব্যাঙ্কে মজুত। স্বামী অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাওয়ার দরুন রেলওয়ে থেকে সেকেণ্ড ক্লাস যাত্রীর প্রাপ্য কমপেনসেশনও পেয়েছে। তাছাড়া নিজেরও মাসের উপার্জন এখন প্রচুর। কিছু না করেও ছেলে নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেবার মতো যথেষ্ট। মাঝে মাঝে মনে হয়, এখানকার চাকরি আর প্র্যাকটিস ছেড়ে ছেলে আর পার্বতীকে নিয়ে দূরে অন্য কোনো রাজ্যে চলে যাবে কিনা, যেখানে তাদের কেউ কোনদিন জানবে না, চিনবে না। তাছাড়া যেখানে যাবে, প্র্যাকটিস তো কিছু না কিছু সব জায়গাতেই করতে পারবে। কাগজে বিজ্ঞাপনে ডক্টর মিসেস হাজারিকা নাম ছিল। অন্য কোথাও চলে গেলে হাজারিকা না হয় মুছেই দেবে। ডাক্তারী ডিগ্রীর সার্টিফিকেটে তো আর হাজারিকা নেই। যেখানে যাবে সেখানে ফিরে না হয় আবার শর্মিলা বরকাকুতিই হবে।

মনের কথা বলার মানুষ একমাত্র পার্বতী চেটিয়া। অত কথা না বলে আর কোথাও চলে গেলে কি হয় এ-আলোচনা তার সঙ্গেও করেছে। বলেছে, এখানে আর ভালো লাগছে না। কেন যাওয়ার চিন্তা, কেন ভালো লাগছে না সেটা পার্বতীও বুঝতে পারে। সে-ও

তক্ষুণি রাজি। বহীনজির চাপা ভয়ের দরুন সেও ভিতরে ভিতরে উতলা। এখন আর শুধু স্বার্থের কারণে নয়, ওই বাচ্চাটা তারও চোখের মণি। তাকে ছেড়ে আর ওই বা থাকবে কি করে?

কিন্তু অহেতুক ভয়ে এই জায়গা ছেড়ে চোরের মতো পালিয়ে যাবার চিন্তা শর্মিলা নিজেই আবার বাতিল করেছে। আর যা-ই হোক সেটা সততা হবে না। ভিতরে সমস্ত জীবন একটা অপরাধ বোধ খচখচ করবে। তাতে ছেলে বা ওর কারোই মঙ্গল হবে না। এ-জীবনে শর্মিলা কোনদিন মিথ্যের আশ্রয় নেয়নি। বরং পালানোর চিন্তা মাথায় এসেছে বলেই নিজের কাছে নিজে ছোট হয়ে গেছে। সত্যের আশ্রয়ে থাকলে কেউ কখনো সব খোয়ায় না। ওই সত্যটুকুই তার সম্বল।

সুস্থ বুদ্ধি দিয়ে এটুকু বোঝে, চার-পাঁচটা মাস কেটে গেল, এরপর খুব আপনার জন আর কেউ আসতে পারেই না। দূরের আত্মীয়তার সুতো ধরে ছেলের দাবি নিয়ে আসবে এমন গরজ কার? গরজ থাকলে তাও এতদিনে আসত। আর এর পর কোনো যোগসূত্র ধরে আসেই যদি কেউ, তাহলেই বা এত সহজে বাবুলকে কেড়ে নেবে কি করে? এরপর কেউ এলে বুঝতে হবে টাকার লোভে এসেছে। সে-রকম দরকার হলে শর্মিলা টাকা দিয়েও রফা করতে পারবে।

এই সাদা সত্যের ওপরেই নির্ভর করবে সে। আর নির্ভর দেয়ালে টাঙানো মোহনের বড় ফোটোটা। সে দিকে চেয়ে শর্মিলা মনে মনে বলে, বাবুলকে দিয়ে তুমি দুষ্টুমি করে চলে গেছ। তুমি যখন আর ফিরবে না, তোমার দেওয়া বাবুলকে আর কেড়ে নেবার সাধ্যি কার?

ফোটোয় মোহনের চোখে মুখে দুষ্টু দুষ্টু মিষ্টি হাসি।

আরো পাঁচটা বছব কেটে গেছে। শর্মিলার আব ভয়-ডরের লেশমাত্র নেই। পার্বতী চেটিয়াও নিশ্চিন্ত। অতীত ভুলেছে অনেকেই। নতুন যারা দেখে তারা জানে ডক্টর মিসেস হাজারিকার স্বামী নেই, ছেলে আছে একটা। ফুটফুটে ছোট্ট দুষ্টু ছেলে বাবুল—বাবুল হাজাবিকা! ছয় পেবিয়ে সাতে পা দিয়েছে ছেলেটা। যেমন মিষ্টি তেমনি দুষ্টু। কিন্তু মায়ের আদর যেমন, শাসনও তেমনি। শর্মিলা বোজ খুব সামলে তাকে দু' ঘণ্টা করে পড়ায়। সেও খেলার ছলে পড়ানো। এক বছর আগে একটা নার্সারি স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে তাকে। পার্বতী দিয়ে আসে নিয়ে আসে। মায়ের থেকে আন্টির সঙ্গে তাব রাগ ঝগড়া আদর আব্দারের সম্পর্ক বেশি।

আন্টিই তাকে দেয়ালের ফোটো দেখিয়ে আরো কয়েক বছর আগে বাবা চিনিয়েছে। সেই সময় থেকে রোজ সকালে উঠে ফোটোর দিকে চেয়ে বাবাকে গুড মর্ণিং করতে হয়। আর দু' হাত জোড় করে কপালে ঠেকাতে হয়। বিকেলে বেড়াতে বেরুলে বা স্কুলে কেউ যদি ওকে বাবার কথা জিজ্ঞেস করে, ও গম্ভীর মুখে জবাব দেয়, বাপী ইজ ইন হেভেন।

পার্বতী সুখের মুখ দেখেছে। এতদিনে আগের ডবল মাইনে পাচ্ছে বলে নয়। মাইনের খবর ও ভালো মতো রাখেও না। মাস গেলে মাইনের টাকা বহীনজি ওর নামে ব্যাঙ্কে জমা করে দেয়।

পাশবইটইও বহীনজির কাছে। এত বছরে কত হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা হল তাও সঠিক মনে থাকে না। কোনো উৎসব-টুৎসব উপলক্ষে বা সামাজিক কারণে মেঘালয়ে ভাইদের কাছে কিছু পাঠানোর জন্য টাকা তুলতে চাইলে বহীনজি সেই বাড়তি টাকা ওকে দিয়ে দেয়, ব্যাঙ্ক থেকে কিছুই তুলতে দেয় না। এতদিনের মধ্যে মাত্র দু'বার ভাইদের বাড়ি গেছে। এখন তার কদর খুব। আদরযত্নের ত্রুটি নেই। কিন্তু পার্বতী একবারও চার-পাঁচদিনের বেশি থাকতে পারে নি। মন টেকে না। তাছাড়া ও না থাকলে এদিকের সংসার অচল সেই দায়িত্ববোধ আছে। বেশি থাকবে কি করে?

শর্মিলা হাজারিকা এখন বত্রিশ ছাড়িয়ে তেত্রিশে পড়েছে। কিন্তু দেখলে মনে হয় বয়েসটা সেই একই জায়গায় থেমে আছে। একটা সংযম আর শুচিতা যেন তার অঙ্গ স্পর্শ করে আছে। একমনে কাজ করে। কাজের মধ্যে শান্তি। আর ঘরে ফিরে বাবুলকে দেখে শান্তি। এই স্নিগ্ধ সংযমে আর ব্যক্তিত্বের গণ্ডী টপকে কেউ কাছে আসতে পারে না। অথচ আসার জন্য এখনো ব্যগ্র উন্মুখ অনেকে। ওর দিক থেকে এতটুকু প্রশ্রয়ের আভাস পেলে তারা বর্তে যেত। পায় না। ও চাইলে যোগ্য দোসরের অভাব হবে না। বাবুল ঘরে না এলে দোসরের কথা নিজেও ভাবত কিনা বলা যায় না। যে এসেছিল তার প্রতি স্নেহের যোগ কোনদিন মন থেকে মুছে যাবার নয়। সে নেই, বাবুল আছে। যোগ্য দোসরের অভাব বোধ আগেও মনে ঠাঁই দেয় নি, আর দিতেও রাজি নয়।

সন্ধ্যায় চেম্বারে রোগী দেখছিল। টেলিফোনে পার্বতীর চাপা গলা। একজন অচেনা লোক খানিক আগে সোজা ঘরে চলে এসেছে, বহীনজির নাম করে খোঁজ করেছে, বহীনজির ছেলে শুনে বাবুলকে খুব আদর-টাদর করেছে আর তার বাবার খবরও জিজ্ঞেস করেছে। পার্বতী একটু কড়া মেজাজ দেখিয়ে ভদ্রলোককে পাশের

ঘরে নিয়ে এসেছে, বাবুলকে আসতে দেয় নি। পাশের ঘরে বসে ভদ্রলোক আবার বাবুলকে ডাকছে। পার্বতী নাম জিজ্ঞেস করতে বলে দিল, তুমি চিনবে না, চেম্বারে টেলিফোন করে তাকে ধরো, আমি কথা বলছি।

শর্মিলার বুকের ভিতরটা ছ্যাঁক করে উঠেছিল। এখনো ধপধপ করছে। কে হতে পারে ভেবে পাচ্ছে না। অথচ শেষের কথা শুনে মনে হল, চেনা লোকও হতে পারে। কিন্তু পার্বতী চেনে না এমন কে আছে? বলল, আগে নাম জেনে এসো, বলো বেডরুমে টেলিফোন তাই আমিই নাম জানতে চেয়েছি।

একটু বাদে ঘুরে এসে পার্বতী জানালো, নাম ডক্টব বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য।

বিস্ময়ে আনন্দে শর্মিলা হাঁসফাঁস করে উঠল। বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব আপনার লোক, তাঁকে টেলিফোন দাও, আর শোনো, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই চেম্বার বন্ধ কবে আসছি, তুমি তাঁকে আদর যত্ন করে বসাও, বাবুলকেও যেতে দাও—আর ভালো করে তাঁর জন্য চা জলখাবারের ব্যবস্থা করো।

পার্বতী রিসিভার রেখে ও ঘরে গেল। শর্মিলা উদ্‌গ্রীব। এক মিনিটের মধ্যে ডক্টর ভট্টাচার্যর গলা পেল।—হ্যালো, চেনা লোকই মনে হচ্ছে তাহলে?

—কি কাণ্ড! শর্মিলা উৎফুল্ল, আপনি এসে নামটা পর্যন্ত বলেন নি, আমি বুঝব কি করে?

পার্বতী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। তার দিকে চেয়ে ডক্টর ভট্টাচার্য হেসে জবাব দিল, আমার অভ্যর্থনার জন্য যে মেয়েটি বাড়িতে তোমার ছেলে নিয়ে আছে, তার মুখ দেখে মনে হল বাড়িতে এই ভরসন্ধ্যায় ডাকাত পড়েছে। তাই নাম না বলে দেখছিলাম কি হয়—

—খুব ভালো, টেলিফোনে আর একটা কথাও শুনতে চাই না —আপনি আধ ঘণ্টা বসুন, যে দু'জন রোগী আছে তাদের চটপট

দেখে নিয়ে আমি এক্ষুণি ছুটছি।' যাবেন না কিন্তু।

—আচ্ছা এসো।

শর্মিলা আধ ঘণ্টার আগেই চলে এলো। গাড়ি থেকে নেমে ঘরে ঢোকার আগে দেখে পার্বতী বাইরে দাঁড়িয়ে। এমনিতেই গম্ভীর, কিন্তু এই মুখ যেন আরো একটু গম্ভীর। তাকে দেখে কাছে এসে চাপা গলায় বলল, ভদ্রলোক শুধু এক পেয়ালা চা ছাড়া আর কিছু খেলেন না, এখন বাবুলকে জড়িয়ে ধরে চুপচাপ বসে আছেন।

কারণও বলল পার্বতী। খুব খুশি মেজাজেই ছিল ভদ্রলোক, বাবুলকে বাবার কথা জিজ্ঞেস করতে ও তাকে শোবার ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে ফোটোতে বাবাকে দেখালো, আর বলল, বাপী ইজ ইন হেভেন। তাই শোনার পর ভদ্রলোক কেমন যেন হয়ে গেলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করতে আমি শুধু সাহেবের ট্রেন অ্যাক্সিডেণ্টে মারা যাবার কথাই বলেছি।

একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে শর্মিলা হাসিমুখেই ঘরে ঢুকল। বলল, এ এমন একটা সারপ্রাইজ, পার্বতী ফোনে নাম বলার আগে আমি তো ভাবতেও পারিনি—আপনি!

ডক্টর ভট্টাচার্য তার আপদমস্তক দেখে নিলেন একবার। বিয়ের আগের কুমারী বেশ। না জানা থাকলে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না এই মেয়ের জীবনে কি ঘটে গেছে। হাসতে চেষ্টা করেও হাসি ঠিক এলো না। বললেন, সারপ্রাইজ দুজনেরই—এই শোনার জন্য না এলেই ভালো করতাম।

বাবুল ঘোষণা করল, মাম্মি, আঙ্কল খুব ভালো।

—খুব ভালো। অনেক গল্প করেছিস, এখন খেলগে যা।

বাবুল আণ্টির খোঁজে বাইরে চলে গেল। ডক্টর ভট্টাচার্য জিজ্ঞেস করলেন, এই বরাত হল কবে?

সহজভাবেই শর্মিলা ঘুরিয়ে জবাব দিল, অনেকদিন হয়ে গেল,

বাবুলের আট-ন'মাস বয়সের সময়।

—বলো কি! আরো ব্যথিত ডক্টর ভট্টাচার্য।—আমি আর কি করে জানব বলো।

শর্মিলা তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে ফেলল।—আপনি করে এসেছেন? এখানেই জয়েন করছেন তো?

ডক্টর ভট্টাচার্য হাসলেন।

এই হাসির অর্থ একটু পরে জানা গেল।...দেশে ফিরেছে দু' বছর আগে। এখন তার কর্মক্ষেত্র অরুণাচলের এক ছোট্ট শহরে। নাম দিরাং। এখনো ওটা শহর ঠিক নয়, শহর হয়ে উঠছে।

শর্মিলা অবাক। দেশ-বিদেশের এত অভিজ্ঞতা কুড়নোর পরে শেষে কিনা অরুণাচলে—যার তিন ভাগের দু'ভাগ জঙ্গল আর প্রায় সবটাই বরফ ঢাকা পাহাড়!

এই মতি কেন শর্মিলা তাও শুনল। কেউ জোর করে নি, ভারত সরকারের আবেদনে নিজেই সাড়া দিয়েছে ভদ্রলোক। তার আগে সেই জঙ্গল আর তুষার রাজ্যের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে দেখেছে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ কেমন প্রকৃতির মুখ চেয়ে জীবন আঁকড়ে বসে আছে। বিনা ওষুধে বিনা চিকিৎসায় আর বিনা নালিশে দূর-দূরান্তের গাঁয়ের কত মানুষ পটাপট দিব্বি মরে যাচ্ছে। সীমান্ত রক্ষার প্রয়োজনে বারো মাস সেখানে ফৌজী ঘাঁটি মোতায়েন। দক্ষিণে আসাম ছাড়া বাকি তিন দিকেই সীমান্ত রেখা। তাই মিলিটারির প্রাধান্য বেশি সেখানে। হালের যা কিছু উন্নতি তার সবটাই মিলিটারির কল্যাণে।

মিলিটারি বা শহরের অন্যান্য শিক্ষিত আর পদস্থ নাগরিকদের জন্য সবরকম মোটামুটি ব্যবস্থা আছে। কিন্তু দুর্গম পথের দরুন দূর দূরের গ্রামের মানুষগুলো বছরের কত সময় সভ্য এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় লেগেই আছে। তামাম অরুণাচলে গ্রামের সংখ্যা তিন হাজারের মতো। যেখানে গড়ে

তিনশ' লোকের জন্য একজন করে ডাক্তার দরকার, সেখানে তিন হাজারেও একজন নেই। হাসপাতালগুলোও বহু গাঁয়ের মানুষের নাগালের বাইরে।

ভারত সরকারের আরো অনেকগুলো সিভিল হাসপাতাল করাব প্রোজেক্ট আছে। আশেপাশের কতগুলো করে গ্রামের জন্য নিকটতম ছোট শহরে একটা করে হাসপাতাল হবে। প্রত্যেকটা হাসপাতালের অধীনে দুটো বা তিনটে করে চেন ক্যাম্প থাকবে। ছোট ডিসপেনসারি, একজন পাস করা ডাক্তার আর কম্পাউণ্ডার নিয়ে চেন ক্যাম্প। এতে গাঁয়ের সাধারণ রোগীদের মূল হাসপাতাল পর্যন্ত ছুটে আসতে হবে না, গুরুত্ব বুঝে ক্যাম্প থেকেই তাদের পাঠানো হবে। ক্যাম্পগুলো চলবে ছোট শহরের হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে, আবার এই হাসপাতাল নিকটতম বড় শহরের হাসপাতাল থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য পাবে।

প্ল্যান অনুযায়ী ভারত সরকার পথ-ঘাট চলাচল ব্যবস্থা আর কনস্ট্রাকশনের ব্যাপারে মিলিটারির সঙ্গে হাত মিলিয়ে এগুনোর ব্যবস্থাও করেছে। ডক্টর ভট্টাচার্যর হাসপাতাল বমডিলা থেকে পাঁচশ' মাইল দূরে আর দু' হাজার ফুট নিচে ছোট শহর দিরাংয়ের মাঝামাঝি জায়গায়। সেখান থেকে আগে আর পিছনে অন্তত দুটো চেন ক্যাম্প করার সঙ্কল্প তাঁর। সামনের দিকে আরো একটা হলে ভালো হয়। কাছে দূরের বিশ-তিরিশটা গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ থাকে তাহলে। কিন্তু ক্যাম্প এখন পর্যন্ত একটার বেশি হয়ে ওঠে নি। ডাক্তারের অভাব। ওখানে গেলে মাইনে অবশ্য বেশি, কিন্তু প্রাইভেট প্র্যাকটিসের প্রশ্ন নেই যখন, কত আর বেশি। তাছাড়া শুধু সেবা লক্ষ্য এমন মন না হলে এত ধকল সহ্য করে কে?

বরাবরকার জন্য ডাক্তার পাওয়া শক্ত, এক বছর দু' বছরের কন্ট্রাক্টে দুই একজন উৎসাহী তরুণ ডাক্তার জোটানো যায়

কিনা সেই চেষ্টায় গৌহাটি এসেছেন ভদ্রলোক। সাগ্রহে শর্মিলাকে বললেন, তোমার অদৃষ্ট তো দেখছি আমারই মতো—তুমি যাবে? মন যদি দিতে পারো, খুব ভালো লাগবে, নিজের শোক আগলে থাকাটা অনেক তুচ্ছ মনে হবে, এ আমি জোর করে বলতে পারি। ··তবে প্রাইভেট প্র্যাকটিস থাকাব দরুন এখানে হয়তো তোমার রোজগার অনেক বেশি। তবে এক-আধ বছরের জন্য ভলান্টিয়ার করতে পারো, কত আব লোকসান ··আব চাইলে গভর্ণমেণ্ট হয়তো আরো কিছু বাড়তি সুবিধে দিয়েই তোমাকে বিলিজ করে দেবে।

লোকসান বা বাড়তি সুবিধের ধার ধারে না শর্মিলা। চাকরি বা প্র্যাকটিস কোনো কিছু না করলেও স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারে। একঘেয়ে এই জীবন আর ভালো লাগছে না। ক'বছর আগে ববাবরকার মতো এখান থেকে চলে যেতে চেয়েছিল ভয়ে। পাঁচ-ছ'বছর কেটে গেছে, সে-ভয় আর নেই। তবু শোনামাত্র ভেতরটা কেন চনমন করে উঠল জানে না। কিন্তু তারপরেই দ্বিধা। বলল, কিন্তু ছেলে ··তার পড়াশুনা?

ডক্টর ভট্টাচার্যর মতে এটা কোন সমস্যাই নয়। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আছে সেখানে। নিজে ছেলেকে দেখাশুনার সময় বরং সেখানে গেলে আরো বেশি পারে, শর্মিলা। আর ছেলেটা যদি ওই প্রকৃতির মধ্যে বড় হতে পারে, তাহলে নিজের দু'পায়ে দাঁড়ানোর জন্য কখনো তাকে ভাবতে হবে না।

ডক্টর ভট্টাচার্য তিনদিন ছিলেন। শর্মিলা ভাবার সময় চেয়েছিল। যত ভেবেছে, যাওয়ার ইচ্ছে ততো বড় হয়ে উঠেছে। .এখন তো আর কোনো অনাগত ভয় বা সত্যের মুখোমুখি হবার সম্ভাবনা থেকে সে পালাচ্ছে না। জীবনযাপনের কিছু বৈচিত্র্য তার নিজের প্রয়োজনেও তো দরকার। গোড়ায় না হয় এক বছরের কণ্ট্রাক্ট সার্ভিসেই যাবে—ভালো না লাগলে চলে এলেই হল।

এ-ব্যাপারে ডক্টর ভট্টাচার্যর আগ্রহ তার থেকে কম নয়। সেই

কারণে শর্মিলার উৎসাহ যেমন, আবার তলায় তলায় অস্বস্তিও একটু। ভদ্রলোক বয়েসে দশ বছরের বড় তার থেকে। শর্মিলার কাছে এখন অন্তত সেটা কোনো সমস্যা নয়। কিন্তু এই হৃদ্যতার সম্পর্ক আর কোনো অন্তরঙ্গ সম্ভাবনার দিকে গড়াক শর্মিলা তা চায় না। কিন্তু ভদ্রলোক চাইলে?

প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে উত্থাপন করেছিল শর্মিলা। বলেছিল, এখানে আমি ভালো আছি, টাকাও অনেক রোজগার করছি। কিন্তু ভালো লাগছে না। বাবুলকে নিয়ে আর নিজের কাজ নিয়ে বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটিয়ে দিতে চাই। এখানে শান্তির সরাসরি ব্যাঘাত কিছু হচ্ছে না বটে, কিন্তু অনেকের লোভ আমাকে ঘিরে আছে সেটা বুঝতে পারি। এজন্যেও এখান থেকে চলে যাবার কথা মাঝে মাঝে মনে হয়··

ডক্টর ভট্টাচার্য মুখের দিকে চেয়ে রইলেন খানিক। তারপর বলেই ফেললেন, তা এখন তাহলে তোমার সমস্যাটি কি আমাকে নিয়ে নাকি। হেসে উঠলেন, বললেন, জীবনের আমি কিছু বড় অর্থ খুঁজে পেয়েছি—তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

শর্মিলা লজ্জা পেল। মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিল। সে-রকম হলে এই লোককে নিয়ে সমস্যা বিয়ের আগেই দেখা দিত।

ডক্টর ভট্টাচার্য আবার বলল, তোমাকে ভালো লাগে এটা অবশ্য ঠিক কথা, কিন্তু ভালো লাগার মধ্যে অসম্মানের কিছু নেই, ভিক্ষেরও কিছু নেই। কোনরকম দ্বিধা বা ভয় থাকলে যেও না।

শর্মিলা এগিয়ে এসে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল তাকে। বলল, আমি যাব, আপনি ব্যবস্থা করুন।

এরপর বাস্তব আলোচনা। শীতকাল এখন। এটাই সব থেকে কষ্টের আর দুর্যোগের সময়। ওইটুকু ছেলে নিয়ে এখন সেখানে যাবার প্রশ্ন ওঠে না। নতুন ক্যাম্পও এপ্রিলের আগে হবে না।

তাই এপ্রিলের মাঝামাঝি অর্থাৎ আরো চার মাস বাদে যাবার

ব্যবস্থা পাকা হল। ডক্টর ভট্টাচার্য আপাতত এক বছরের কণ্ট্রাক্ট-এর কথা বলল। ভালো লাগলে বা ছেলেটার সহ্য হলে মিয়াদ বাড়ানো যাবে। এখানকাব হাসপাতালের ওপরঅলার সঙ্গেও কথা-বার্তা পাকা কবে গেল ভদ্রলোক। আর পার্বতীকেও বেশ বাড়তি লাভের আশ্বাস দিয়ে গেল। ক্যাম্পে ট্রেণ্ড নার্স তো পাওয়াই যায় না। শর্মিলার ট্রেণ্ড অ্যাটেনডেণ্ট হিসেবে সে-ও ভালো মাইনে পাবে থাকা খাওযার আলাদা খরচ পাবে। কিন্তু বহীনজির কাছেই থাকবে যখন তাব সবটাই লাভ।

বাবুল অত বোঝে না। শর্মিলা আর পার্বতী নতুন রোমাঞ্চে ভরপুব। মাঝেব চাবটে মাস যেন প্রচণ্ড বকমের দীর্ঘ তাদের কাছে।

কিন্তু এক মাস না যেতে নীল আকাশ থেকে যেন আচমকা বাজ খসে পড়ল একটা। শর্মিলা সচকিত, বিমূঢ়। খবরটা সত্যি কি মিথ্যে যাচাই হবাব আগেই এক অজানা অন্ধকারে ডোবার দাখিল তার!

মেজভাইয়ের মেয়ের বিয়েতে পার্বতীর দেশে অর্থাৎ মেঘালয়ে না গিয়ে উপায় ছিল না। ভাই আর ভাইয়ের বউদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, দু-পাঁচ দিনের জন্য হলেও একবার অবশ্যই যেন আসে। শর্মিলা বাধা দেয় নি। একে অনেকদিন যায় নি। তারপর তিন মাস বাদে সেই এক জায়গায় রওনা হয়ে গেলে আর কত দিনের মধ্যে আত্মীয়স্বজনের মুখ দেখা হয়ে উঠবে ঠিক নেই। পার্বতী সাত দিনের কড়ারে গেছে। কিন্তু দশদিন হয়ে গেলে ফেরার নাম নেই। এ-রকম কখনো হয় না। পিছুটান শুধু এই জায়গায়, ফাঁক পেলে আগেই বরং চলে আসে। হঠাৎ অসুখ-বিসুখ কিছু করল কিনা ভেবে শর্মিলা চিন্তিত। তাহলেও একটা চিঠি দিতে পারত।

এলো বারো দিনের মাথায়। উৎসব বাড়ি থেকে এলো, অথচ

বিরস মুখ। শর্মিলা প্রথমেই তার শরীরের খবর নিল। পার্বতী জবাব দিল, শরীর ভালো আছে।

নিজে থেকে ও আর কিছু বলল না, তাই শর্মিলাও জিজ্ঞেস করল না। ভাইঝির বিয়েও বেশ ভালোমতো হয়ে গেছে শুনল। এর পরেও দু'তিন দিন ওর শুকনো মুখ। চুপচাপ কাজ করে। কথা এমনিতেই কম বলত, কিন্তু ছেলের সঙ্গেও ওর যেন গল্পসল্প কমে গেল। দেখলেই মনে হয় মাথায় ওর কিছু দুশ্চিন্তা পাক খাচ্ছে।

শেষে শর্মিলাই জিজ্ঞেস করল, তোমার কি ব্যাপার বলো দেখি, দেশ থেকে ফিরে অবধি সর্বদা যেন কিছু একটা চিন্তা নিয়ে আছ?

পার্বতী স্বীকার করল। বলি-বলি করেও বহীনজিকে ভাবনার কথাটা বলে উঠতে পারছে না। অথচ বহীনজিরই জানা দরকার।

—কি ব্যাপার? শর্মিলা অবাকই একটু—বাইরে চলে যাওয়ার ব্যাপারে তোমার কিছু অসুবিধে হচ্ছে নাকি?

পার্বতী জানালো, বহীনজি আর বাবুল থাকলে পৃথিবীর কোথাও যেতে তার অসুবিধে নেই। তার ভাবনা বহীনজি আর বাবুলকে নিয়েই।...তবে সবটাই ওর মিথ্যে দুশ্চিন্তা হতে পারে।

শর্মিলার বুকের ভিতরে ধক করে উঠল। তীক্ষ্ণ চোখে পার্বতীকেই দেখছে। সংযত করল নিজেকে।—সত্যি মিথ্যে আমি বুঝব, তুমি বলো—।

সমাচার শোনার পর শর্মিলাও স্তব্ধ।...পার্বতীর বড় দাদা চাকরি করে আবার জমি আর বাড়ি কেনা-বেচার দালালিও করে। ভাইঝির বিয়ের মধ্যেই একটা বড় বাড়ি বিক্রীর মধ্যস্থতা করছিল সে। বাড়ির মালিকের লেনদেন শেষ। অরুণাচলের কোথায় মিলিটারি অফিসার সে। উৎসবের মধ্যে মোটা টাকা হাতে পেয়ে দাদা খুশি। কথায় কথায় বাড়ির মালিকের দুর্ভাগ্যের কথা বলেছিল। ছ-বছর আগে ট্রেন দুর্ঘটনায় তার স্ত্রী আর আট মাসের ছেলে মারা যায়। স্ত্রীটি মেঘালয় থেকে আসামের কোথায় এক আত্মীয়ের

বাড়িতে এসেছিল। সেখান থেকে গৌহাটি আসার পথে ট্রেন অ্যাক্সিডেণ্টে সব শেষ।

একটু শুনেই শর্মিলা পাথর।

…বিয়েব ক'টা দিন পার্বতী আর বিশেষ কোনো খোঁজখবব নিতে পারে নি। কিন্তু উৎসব তাব মাথায় উঠেছিল। কাজকর্ম শেষ হয়ে যেতে দাদাকে বুঝতে না দিয়ে সেই বাড়ির হদিস বার কবেছে। সেই বাড়িব আশপাশের পুরনো বাসিন্দাদের সঙ্গে আলাপ-পবিচয করেছে। তাবপর যে খবর সংগ্রহ করেছে তাতে ভাবনা আবো বেড়েই গেছে। পার্বতী দেখেছে, বেশ বড় বাড়ি, আব অনেকটা জমিজমা। মালিকের নাম দিলীপ ডেকা। মিলিটারি এনজিনিয়ার। বুড়ী মায়েব কাছে আট মাসের ছেলে আর বউকে বেখে জরুরী নির্দেশ পেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে পাড়ি দিতে হয়েছিল। দেশেব এক মাথা থেকে একেবাবে অন্য মাথা। পূব পাকিস্তানেই জোব যুদ্ধ হচ্ছিল তখন, কিন্তু সেই এনজিনিয়ারের ওপর পশ্চিমে যাওযাব হুকুম হযেছিল। একাত্তর সাল সেটা। পশ্চিমেও যুদ্ধ হচ্ছে।

বুড়ী মায়ের কাছে বউ আর বাচ্চার ট্রেন অ্যাক্সিডেণ্টে নিহত হবার খবর গেল। সেও দুর্ঘটনার পাঁচ দিন পরে। হয়তো যে আত্মীয়ের বাড়ি গেছল বা গৌহাটিতে যাদের কাছে যাবার কথা ছিল, তারা তত্ত্ব-তালাস কবে এ-খবর পাঠিয়েছে। ওখানকার মিলিটারি দপ্তরের মারফৎ পশ্চিম পাকিস্তানেও তার পাঠানো হয়েছিল। ছেলের অপেক্ষায় ওষ্ঠাগত প্রাণ নিয়ে বুড়ী বেঁচেছিল। তারপর সেও চোখ বুজেছে। আবার তার ছেলের কাছে তার গেছে।

…কিন্তু প্রায় দু' বছর বাদে জানা গেছে কোনো তারই সেই ভদ্রলোকের কাছে পৌছয়নি। কারণ লাহোরে যুদ্ধবন্দী ছিল সে। এই দীর্ঘকাল বাদে ছাড়া পেয়ে দুর্ভাগ্যের খবর জেনেছে। দিন আট-দশের জন্য একবার দেশে ফিরেছিল। কিন্তু তখন কারো

সঙ্গে মেশেনি, কারো সঙ্গে কথা বলেনি। পাঁচ-ছ'মাস বাদে আর একবার এসে পার্বতীর দাদাকে বাড়ি বিক্রীর কথা বলে গেছল। সেই বিক্রীই এবার হয়ে গেল।

পার্বতীর বুকে হাতুড়ির ঘা পড়ছিল। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ।—তোমার এত ভয় কেন, অ্যাক্সিডেন্টে অনেক বাচ্চা অনেক বউ মরেছে তো ঠিকই—বাবুলের কথা তুমি কাউকে বলেছ নাকি?

আহত মুখে পার্বতী মাথা নাড়ল। সে কাউকে একটি কথাও বলে নি। ছেলেব গলার লকেটে 'ডি' লেখা ছিল বলেই তার আরো বেশি ভাবনা। ওই 'ডেকা' পরিবারে নাকি ঘটা করে আট মাসের ছেলের অন্নপ্রাশনের উৎসব হয়েছিল। বাপ বহু টাকা খরচ করেছিল। তার তিনদিনের মধ্যে জরুরী নির্দেশে তাকে চলে যেতে হয়।

আশ্বস্ত হবার পর প্রথমেই শর্মিলা অরুণাচলে যাওয়া নাকচ করে দেবে স্থির করল। ডক্টর ভট্টাচার্যর ঠিকানা তার কাছে আছে। কোনো কারণ না জানিয়ে লিখে দিলেই হল, যাওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু একটা করে দিন যাচ্ছে লেখা আর হয়ে উঠছে না। অথচ ভিতরের অস্থিরতা বাড়ছেই, বাড়ছেই। যত ভাবছে যাবে না, নিজের কাছেই তত যেন ছোট হয়ে যাচ্ছে। আবার বাবুলকে কেউ তার বুক থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে, ভাবতে দুঃসহ যন্ত্রণা।.

তা হলেও সত্যের আশ্রয় ছাড়বে কি করে শর্মিলা। সত্যের আলো থেকে শেষে প্রবঞ্চনার সুড়ঙ্গে গিয়ে সেঁধোবে? মন বাঁধল। সংকল্প স্থির। যাবে। পার্বতী যার কথা বলছে, গেলেও তার সঙ্গে জীবনে কখনো দেখা হবে কিনা ঠিক নেই। সাড়ে একান্ন হাজার বর্গমাইলের এক রাজ্যের কোথায় দিলীপ ডেকা নামে এক লোক পড়ে আছে, তা নিয়ে তার এত মাথা ব্যথা কেন? ডক্টর ভট্টাচার্য পর্যন্ত বাবুলকে শর্মিলার ছেলে বলেই জানে। অরুণাচলে গিয়ে

শর্মিলা কি বাবুলের সম্পর্কে ঢাকঢোল বাজিয়ে দিলীপ ডেকার খোঁজ করে বেড়াবে। তাছাড়া লকেটেব 'ডি' অক্ষর মিলেছে বলেই ধরে নিতে হবে ডেকা বংশেব ছেলে বাবুল, তাব কি মানে? সেই ট্রেন দুর্ঘটনার সংবাদ পবেব দিনেব কাগজেই বড করে ছাপা হযেছিল। কিন্তু শর্মিলার কাছে শুধু কাগজে নিজের দেওয়া বিজ্ঞাপনেব কপি আছে গোটাকতক। খুব ইচ্ছে হল, বড় কোনো কাগজেব আপিসে গিযে ফাইল ঘেঁটে দেখে সেই দুর্ঘটনায় ছ-আট-দশ মাসের কত শিশু মাবা গেছে তার সংখ্যা কিছু আছে কিনা। যতদুব মনে পড়ে মায়েব কোলে কযেকটি মৃত শিশুর ছবিও কাগজে দেখেছিল।

না. শেষ পর্যন্ত এই দুর্বলতাব প্রশ্রয়ও দিতে পারল না শর্মিলা। সে যাবে। তাবপর সত্য তাকে যেখানে এসে দাঁড় করিয়ে দেয়, তাই মেনে নেবে।

সংকল্প স্থির হবার পব বিবেকের দংশন অন্তত কমলো। আর সেই সঙ্গে দিলীপ ডেকা নামে অজানা অচেনা একটা মানুষের সম্পর্কে একটু. কৌতুহলও দানা বেঁধে উঠতে লাগল। বিবেক-বিবেচনা সম্পন্ন সকলেবই এই কৌতুহল স্বাভাবিক।

আসামের তেজপুর থেকে যাট কিলোমিটার পথ ভালুকপং। বাবুল আর পার্বতীকে নিয়ে ট্রাকে এসেছে শর্মিলা। ডক্টর বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য ওদের রিসিভ করার জন্য ভালুকপং-এ উপস্থিত

থাকবেন জানিয়েছিল। এটাই দক্ষিণের বর্ডার। এখান থেকে অরুণাচল শুরু। সিভিল আর মিলিটারি দুইয়েরই বসতি এখানে। তবে মিলিটারির প্রাধান্য বেশি। ডক্টর ভট্টাচার্য জানালো এখানে সর্বত্রই তাই।

মিলিটারি শুনলেই অদেখা-অচেনা এক মানুষের নাম মনে আসে শর্মিলার। তাই সর্বত্র এখানে তাদের প্রাধান্য শুনলে ভিতরের থিতনো অস্বস্তিতে নাড়া পড়ে। জোর করেই আবার মন থেকে সেটা ঝেড়ে ফেলতে হয়।

ডক্টর ভট্টাচার্য একটা মাঝারি ট্রাক নিয়ে এসেছে। বাচ্চা নিয়ে প্রথমবারের আসা, সঙ্গে মালপত্র বেশি থাকবে জানা কথাই। এই শীতের রাজ্যে গ্রীষ্মকাল বলে কিছু নেই। কিছুদিনের জন্য একটু ঋতু বদলের আভাস মেলে এই পর্যন্ত। এছাড়া হয় বর্ষা নয় শীত। তাই ডক্টর ভট্টাচার্যের নির্দেশ মতো দরকারি সাজ-সরঞ্জাম কম আসেনি সঙ্গে। হাসপাতালের ব্যবহারের জন্য একটা জিপ ডক্টর ভট্টাচার্যের হেপাজতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মিলিটারি বিভাগকে প্রয়োজনের কথা জানিয়ে ভদ্রলোক ট্রাকের ব্যবস্থা করেছে। সবেতে এখানে মিলিটারির সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ শুনেও শর্মিলা খুশি হতে পারল না।

ডক্টর ভট্টাচার্য হাসি হাসি মুখে জানালেন, এখানে আসার আগেই তোমার বেশ সুনাম হয়ে গেছে। যেখানে পুরুষ ডাক্তার পা ফেলতে চায় না, সেখানে স্বেচ্ছায় একজন মেয়ে ডাক্তার আসছে গ্রামের মানুষের সেবা করতে—এ এখানে কম কথা নয়।

ভালো কথাও কানে ভালো লাগছে না কেন শর্মিলার? সে কি এখানে সুনাম পেতে এসেছে না কাজে ডুবতে এসেছে? আসল কথা, সুনামের সঙ্গে প্রচারের যোগ। এই প্রচারই সব থেকে অবাঞ্ছিত শর্মিলার।

শর্মিলাকে এত চুপচাপ দেখেই হয়তো একটু উৎসাহ দেবার

চেষ্টা ডক্টর ভট্টাচার্যের। এমন এক জায়গায় মন বসতে সকলেরই সময় লাগে জানে। ভালুকপং-এ এসেই চুপ মেরে গেছে—দিরাং-এর গাঁয়ের ক্যাম্পে গিয়ে উপস্থিত হলে হয়তো আরো দমে যাবে। তাই উৎসাহ দেবার সুরে বলল, ক্যাম্পে তো কখনো থাকো নি, কষ্ট কিছু হবে, সঙ্গীও তেমন পাবে না—কিন্তু অ্যাডভেঞ্চারের মন নিয়ে থাকলে খারাপ লাগে না। আর নেহাত যদি ভালো না লাগে তো বমডিলার বড় হাসপাতালে চলে যাবে। ডাক্তারের চাহিদা তো সর্বত্র, বমডিলা পুরোদস্তুর আধুনিক শহর, সেখানে কোনো অসুবিধেই হবে না।

এবারে শর্মিলা শান্ত মুখে জবাব দিল, আমার কিছুই অসুবিধে হবে না। আমি গ্রামের মানুষদের সঙ্গে কাজ করার জন্যেই এসেছি —আপনি যতটা পারেন আমাকে গ্রামের দিকেই ঠেলে দেবেন।

ডক্টর ভট্টাচার্য সাদা অর্থেই নিল কথাগুলো। ওর ভিতরের অস্বস্তির আঁচ বোঝার কথা নয় তার। গভীর সহানুভূতি দিয়ে এই মেয়ের পরিবর্তনের দিকটাই অনুভব করল।

খাওয়াদাওয়া সেরে ট্রাকে চেপে আবার রওনা। এবারে প্রায় নব্বুই মাইল পাহাড়ী রাস্তা ভেঙে যেতে হবে বমডিলা। আট হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের ওপর শহর। সেখান থেকে দিরাং পঁচিশ মাইল। হাজার দুই ফুট নিচে নাচতে হবে। আজকের মতো বমডিলায় বিশ্রাম করে কাল সকালেই দিরাং-এ নেমে আসা যেতে পারে।

শর্মিলা চুপচাপ শুনল শুধু। বেলা এখন সবে এগারোটা। এতটা পাহাড়ী পথ ভেঙ্গে বাবুল কেমন থাকে বুঝে পরের চিন্তা। সম্ভব হলে শহরে রাত কাটানোর ইচ্ছে শর্মিলার একটুও নেই।

বাবুলের মুখে কথার খই ফুটছে। সঙ্গে মা আছে, আন্টি আছে, আঙ্কল আছে—এমন এক অদ্ভুত জায়গায় এসে তার খারাপ লাগবে কেন। তার জিজ্ঞাস্য, পাহাড়ের ওপর মানুষ থাকে কেন, তারা কি

খায়, কি করে। জায়গার নাম ভালুকপং কেন—এখানে অনেক ভালুক থাকে কিনা—

ডক্টর ভট্টাচার্য হাসি মুখেই তার জেরার জবাব দিয়ে চলেছে। ভালুকপং নাম হলেও ভালুকের থেকে এখানে বুনো হাতির উপদ্রব বেশি। দু-দিকের জঙ্গল থেকে হঠাৎ হঠাৎ দল বেঁধে বুনোহাতি বের হয়ে সব ভেঙ্গেচুরে একাকার করে দেয়। হাতি তাড়াতে তখন মিলিটারি ডাকতে হয়। আঙুল তুলে জায়গায় জায়গায় সাইনবোর্ড দেখালো, ইংরেজিতে লেখা আছে, হাতি থেকে সাবধান।

দু'দিকের জঙ্গলে অসংখ্য বুনো কলাগাছ। তাতে বড় আর কালো রঙের কাঁদি কাঁদি কলা ফলে আছে। এই কলাগাছ, আর কলার লোভেই হাতিরা যখন-তখন হানা দেয়।

কয়েক মাইল এগুনোর পর আর লোকবসতি নেই। দু'দিকে শুধু পাহাড় আর জঙ্গল। ট্রাক চড়াই ভেঙে চলেছে। এক-একবার নিচের দিকেও নামতে হয়। সামনে পিছনে মাঝে মাঝে মিলিটারি ট্রাক বা জিপ চোখে পড়ে। এছাড়া আর কোথাও জনমানব নেই।

আকাশ পরিষ্কার। রাস্তা পরিষ্কার। শর্মিলা মুখ বুজে চারদিক দেখতে দেখতে চলেছে। তার ভালো লাগছে। দু'পাশের পাহাড়ের গায়ে অনেক ঝরণা চোখে পড়ছে। এখানকার লোকেরা নাকি ওগুলোকে ঝোরা বলে। ডক্টর ভট্টাচার্য বলল, এখন দেখতে খুব ভালো লাগছে, কিন্তু বর্ষায় ওগুলোই কি বিপত্তি ঘটায় জানো না। ঝোরাগুলোর গতিপথ হামেশাই বদলে যায়, রাস্তাঘাট আর গ্রামকে গ্রাম ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বর্ষায় আর শীতে এ-সব জায়গায় কেবল যুদ্ধ করে বাঁচা। পাহাড় থেকে ধস নামে, তুষার ঝড় বরফের চাঙড় খসে কাঠের ব্রিজ ভাঙে—রাস্তা-টাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়া তখন নৈমিত্তিক ব্যাপার। মিলিটারির তখন সব থেকে ধকলের কাজ রাস্তা পরিষ্কার করা আর নতুন ব্রিজ বানানো।

মোড়ে মোড়ে বহু ছোট ছোট কাঠের ব্রিজ পার হয়ে চলেছে

তারা। এগুলো ভাঙলে চলাচল তো বন্ধ হবেই। পার্বতী চেটিয়া কান পেতে ডাক্তাব আর বাবুলের কথা শুনছিল। তার ভয় করছে না বটে কিন্তু গা ছমছম করছে। তাব খুব আশা ছিল, মেঘালয়ের বাপের বাড়ি থেকে ওই খবব আনাব পর বহীনজি এখানে আসার সংকল্প ছাড়বে। এখন মনে হচ্ছে, আব কিছু না হোক, ছেলে নিয়ে এমন জায়গায় চলে আসাটাই দুঃসাহসেব কাজ হয়েছে।

গল্পেব ফাঁকে ছেলেকেই ডক্টর ভট্টাচার্য জিজ্ঞেস করল, কি রে, এসব শুনে তোব ভয় কবছে না তো?

ছেলে অমনি বুক ফুলিয়ে জবাব দিল, ভয় করবে কেন, মা আছে না সঙ্গে?

এবারে শর্মিলাও না হেসে পাবল না।

বমডিলা।

পাহাড়ের ওপব তকতকে শহব। ডক্টব ভট্টাচার্য বাড়িয়ে বলে নি। জায়গাটা মিলিটাবিতে ঠাসা। অসংখ্য মিলিটারি ক্যাম্প আর মিলিটারি ট্রাক জিপেব আনাগোনা। হাসপাতালে পৌঁছুতে এমনি ডাক্তাবেব সঙ্গে জনাকয়েক মিলিটারি অফিসার আর ডাক্তারও তার অভ্যর্থনায় এগিয়ে এলো।

একজন মহিলা ডাক্তার এখানে কাজে আসছে, তারা জানে। কিন্তু বাচ্চা ছেলেসহ এমন একজনকে দেখবে ভাবেনি যেন। তাদের খুশিমেশা এই বিস্ময়ও কেন যেন একটু অস্বস্তির কারণ শর্মিলার। ডক্টর ভট্টাচার্য একে একে সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। পরিচয় পর্বের পরে হালকা নিঃশ্বাস ফেলেছে শর্মিলা। মিলিটারি অফিসার ক'জনের মধ্যে দিলীপ ডেকা কারো নাম নয়। নিজের ওপরেই ভিতরে ভিতরে তিক্ত বিরক্ত—ওর মাথায় কি ওই নামের একটা ভূত চেপে বসে আছে!

সকলেই ওকে দু'চার দিন এখানে থেকে জায়গাটা ভালো করে

দেখে তারপর দিরাং-এ নামার পরামর্শ দিল। কিন্তু শর্মিলা সে-কথায় কান দিল না। ডক্টর ভট্টাচার্যকে বলল, জায়গা দেখার সময় আর সুযোগ ঢের পাবে। উৎরাইয়ের পথে পঁচিশ মাইল যেতে বড় জোর এক ঘণ্টা। ঘড়িতে এখন চারটেও নয়। তাই আজই দিরাং-এর ক্যাম্পে নেমে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে।

দুটো পাহাড়ের মাঝখানে মোটামুটি সমতল ভূমি দিরাং। দিরাং-এর ছোট হাসপাতাল শহরের মাঝামাঝি জায়গায়। এই হাসপাতাল সংলগ্ন সামনের ক্যাম্প মাইল তিনেকের পথ। সেই ক্যাম্প আরো দেড় বছর আগেই চালু করা হয়েছে।

শর্মিলার জন্য নতুন ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে হাসপাতাল থেকে মাইল আড়াই পিছনে। সামনে পিছনে দু-দিকেই গ্রাম্য বসতি। পিছনের দিকের গ্রাম ক'টার ভার শর্মিলার।

তাই হাসপাতালে পৌঁছনোর আগেই শর্মিলার ক্যাম্প পড়ছে। ডক্টর ভট্টাচার্য বলল, এত মালপত্র নিয়ে আজ আর হাসপাতাল দেখতে গিয়ে কাজ নেই। আজ নিজের ডেরাতেই থাকো আর গোছগাছ করে নাও।

ক্যাম্প বলতে শর্মিলার যা ধারণা ছিল, এ তার তুলনায় অপ্রত্যাশিত ভালো। দু' ঘরের কাঠের বাংলো। ডাইনিং স্পেস আর কিচেনও আছে। মাঝখানে উঠোন, ফুলের বাগান। তার ওধারে আবার দুটো কাঠের ঘর। একটা ওষুধ-পত্র আর ডিসপেন্সারী ঘর। অন্যটা শর্মিলার রোগী দেখার ঘর। বাড়িতে এ-ঘরে কম্পাউণ্ডার থাকতে পারে। কিন্তু শর্মিলা রাতেও এ-ঘর খালি পাবে কারণ একজন স্থানীয় বাসিন্দাকে কম্পাউণ্ডার হিসেবে বহাল করা হয়েছে। লোকটা অনেক দিন বমডিলার হাসপাতালে থেকে কম্পাউণ্ডারের কাজ শিখেছে। এ-সব জায়গায় পাস-করা কম্পা-উণ্ডার আর ক'টা মেলে, স্কুলে যারা লেখাপড়া শিখেছে তাদেরই

ধরে এ-সব কাজে লাগাতে হয়। ডাক্তারের সাহায্য পেলে ঠিক কাজ চালিয়ে নিতে পারে। থাকার বাংলোর সামনে ঢাকা বারান্দা, সেখানে বসার ব্যবস্থা। বেশ সুন্দর কয়েকটা বেতের চেয়ার আর একটা বেতের টেবিল পাতা।

ঘরগুলো কাঠের, মাথার ওপর টিনের চাল। কিন্তু টিন বা কাঠ বোঝার উপায় নেই। ভেতর বার সুন্দর রং করা। দেখলে দালান কোঠার বাংলো মনে হবে। ইলেকট্রিক লাইট আছে, জলেব অভাব নেই।

ছবির মতো এমন সুন্দর ক্যাম্প শর্মিলা বা পার্বতী আশা করেনি।

স্থানীয় লোকেরা আগে থাকতেই জানে, তাদের জন্য একজন মেয়ে ডাক্তার আসছে এই বাংলোয়। ডাক্তার আসছে শুনে তারা খুশি। কারণ এদিকের গ্রামের মানুষদেব আবো আড়াই-তিন মাইল ঠেঙিয়ে তাদের মূল হাসপাতালে যেতে হবে না। আর মেয়ে ডাক্তার আসছে জেনে তারা অবাক। কোনো গাঁয়ের ছেলে বুড়ো গুড়োর কেউ তো আজ পর্যন্ত মেয়ে ডাক্তার চোখেও দেখেনি। আরো তাজ্জব ব্যাপার, এই মেয়ে ডাক্তার শুধু যে মেয়েদের দেখবে তা নয়, পুরুষ রোগীও দেখবে।

অতএব বাংলোর সামনে মালপত্রসহ ট্রাক এসে দাঁড়াতে যারা দেখল তারাই কাছের গ্রামে ছুটে গিয়ে খবর দিল, মেয়ে ডাক্তাব এসে গেছে। তাই শুনে আধ ঘণ্টার মধ্যে আদিবাসীদের অনেকে এসে হাজির। ওদের সঙ্গে হন্তদন্ত হয়ে স্থানীয় কম্পাউণ্ডারও। নাম হানৃডিক। বছর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে বয়েস। ডক্টর ভট্টাচার্য পরিচয় করিয়ে দিলেন। এখানকার স্কুলের আট ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে। তারপর থেকে নানা জায়গার হাসপাতালেই কাজ করে করে বেড়াচ্ছে। হিন্দি ভালোই বলে, ইংরেজি বলাটাও মোটামুটি রপ্ত হয়ে গেছে।

এবারে মেয়ে ডাক্তার মনিব হবে শোনা পর্যন্ত মনে দুর্ভাবনা ছিল। এখন তার হাসি মুখ দেখে উল্টে খুশি।

ডক্টর ভট্টাচার্যের নির্দেশ মতো হাতাহাতি মালমত্র নামিয়ে তারাই সব গোছগাছ করে দিল। ততক্ষণে খবর পেয়ে আরো দূরের গাঁ থেকেও অনেকে মেয়ে ডাক্তার দেখতে এসে গেছে। ঘাগরা পরা মেয়েও এসেছে জনাকতক।

দেখেশুনে শর্মিলার মনে হল এদের সকলের কাছেই ডক্টর ভট্টাচার্য অন্তরঙ্গ আত্মজন। ভদ্রলোক ওদের মেম্পা ভাষাও বেশ রপ্ত করে ফেলেছে। সকলেই তাকে কিছু না কিছু জিজ্ঞেস করছে, আর সে হাসিমুখে জবাব দিচ্ছে। শর্মিলা এটুকু বুঝল, ওদের কৌতূহল আর জিজ্ঞাসাবাদ তাকে নিয়েই। একটু বাদে ডক্টর ভট্টাচার্য কাছে এসে বলল, ডাক্তারি পাস করে তুমি ওদের চিকিৎসার জন্য এখানে থেকে যাবে, এ ওরা বিশ্বাসই করতে পারছে না। " তোমার মুখ থেকে দু'চার কথা শুনলে ওরা কেমন খুশি হয় দেখো, হিন্দিতে বলো, ওরা ঠিক বুঝে নেবে—যারা বুঝবে না তাদের অন্যেরা বোঝাবে—

দাওয়ায় দাঁড়িয়ে সকলের উদ্দেশ্যে শর্মিলা বলল, আমি তোমাদেরই একজন, তোমাদের সেবার জন্য এসেছি। তোমরা যতদিন আমাকে চাইবে ততদিনই থাকব আশা করছি। এখানে এসে আমার সব কিছু ভালো লাগছে—এই আকাশ বাতাস পাহাড় জঙ্গল ভালো লাগছে—তোমাদেরও ভালো লাগছে।

ওরা সকলেই আনন্দে হৈ-হৈ করে উঠল। শাড়ি-পরা হলেও শর্মিলা ওদের কাছে মেম ডাক্তার হয়ে গেল। ডক্টর ভট্টাচার্য জানিয়ে দিল, তিন চার দিনের মধ্যেই তোমাদের মেম ডাক্তারের ক্যাম্পে চিকিৎসা শুরু হয়ে যাবে। গুরুতর কিছু না হলে তিন মাইল পথ ভেঙ্গে আর সামনের বড় হাসপাতালে যেতে হবে না। ওরা খুশি মুখে বিদায় নিল।

সামনের বড় হাসপাতালও শহরের হাসপাতালের তুলনায় খুবই ছোট। শর্মিলা ছেলে আর পার্বতীকে নিয়ে পরদিনই দেখে এসেছে। ডক্টর ভট্টাচার্য জিপ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সর্বসাকুল্যে গোটা পনের বেড। কম করে আরো পনের-বিশটা বেড এখনই দরকার। এখানে ডাক্তার আর একজন আছে। জনা দুই পুরুষ নার্স আছে। গাঁয়ে অসুখবিসুখ বেশি লাগলে ডাক্তার ছেড়ে নার্সদেরও গ্রামে রোগীর বাড়ি ছুটতে হয়। ডক্টর ভট্টাচার্যকে প্রায় রোজই এক-একটা গ্রামে টহল দিয়ে রোগী দেখে বেড়াতে হয়। দরকারে শর্মিলাকেও তাই করতে হবে। কাছাকাছি গ্রামে যেতে খুব একটা অসুবিধে হবে না, দূরের গ্রাম হলে ভাগাভাগি করে জিপ ব্যবহার করতে হবে। যোগাযোগের জন্য দিন কয়েকের মধ্যে হাসপাতাল থেকে তার ক্যাম্পে একটা টেলিফোন এক্সটেনশনের ব্যবস্থা করে দিল ডক্টর ভট্টাচার্য। দুটি মেয়েছেলে বাচ্চা নিয়ে থাকবে, তার দায়িত্ব কম নয়।

দিন তিনেকের মধ্যেই কম্পাউণ্ডার হান্‌ডিক সামনের হাসপাতাল থেকে লিস্ট মিলিয়ে ওষুধ-পত্র আর অন্যান্য সরঞ্জাম খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে ক্যাম্পে এনে সাজালো। এ-কাজে লোকটার উৎসাহ খুব। এরপর ডক্টর ভট্টাচার্যের নির্দেশে সে-ই শর্মিলাকে তার দিকের গ্রাম ক'টায় ঘুরিয়ে আনলো। বাইরে থেকে নতুন কেউ এলে আগে গাঁয়ের মোড়লের সঙ্গে দেখা করা নাকি শিষ্টাচার এখানকার। গ্রামকে এখানকার লোকেরা বলে বস্তি। আর গাঁয়ের মোড়ল বা সর্দারকে গাঁও বুঢ়া। এভাবে যোগাযোগ রাখলে সুনাম হয়, আবার দরকারে অনেক সাহায্যও মেলে ওদের কাছ থেকে। জিপ নিয়ে একদিনে নিজের এলাকার চার-পাঁচটা গ্রাম দেখা সেরে ফেলল শর্মিলা। আন্তরিক সমাদর আর অভ্যর্থনাও পেল সর্বত্র।

অভ্যর্থনা প্রসঙ্গে এক ব্যাপারে আগেই সতর্ক করে দিয়েছিল ডক্টর ভট্টাচার্য। মেহমান মানুষ দেখা করতে এলে গাঁও বুঢ়া এক গেলাস ছুং হাতে আপ্যায়নে এগিয়ে আসবে। ছুং মানে ওদের

ঘরের তৈরি মদ। তার এক হাতে ছং এর গেলাস থাকবে, অন্য হাতে সে অতিথির এক কানের তলার লতি ধরে একটু টেনে দিয়ে ছং-এর গেলাস সামনে ধরবে। মেয়েছেলে বলে শর্মিলাকে ঠিক এই রকম করে আপ্যায়ন জানাবে গাঁও বুঢ়ী' অর্থাৎ সর্দারের বউ। সেই ছং শর্মিলা এক ফোঁটাও গিলতে পারবে না, কিন্তু গেলাসটি যত্ন করে হাতে নিতে হবে, আর একবার অন্তত ঠোঁটে ঠেকাতে হবে। খাই না বললে বা গেলাস হাতে না নিলে ওদের অপমান।

প্রত্যেক বস্তির সর্দারের বউ ঠিক তাই করেছে। কানের লতি টেনে ছং-এর গেলাস এগিয়ে দিয়েছে আর শর্মিলাও হাসি মুখে তা গ্রহণ করেছে। খুশি সকলেই। প্রত্যেক গ্রামের গাঁও-বুঢ়া আশ্বাস দিয়েছে, মেম ডাক্তার তাদের চিকিৎসার জন্য বাড়ি-ঘর ছেড়ে তাদের কাছে এসেছে—এই কৃতজ্ঞতা তারা ভুলবে না। দরকারে গাঁয়ের লোক প্রাণ দিয়েও সাহায্য করবে তাকে।

জবাবে প্রত্যেক গ্রামের মোড়লকে শর্মিলা জানালো তার ক্যাম্প হাসপাতাল রেডি। কোনরকম অসুস্থ বোধ করলেই গাঁয়ের মানুষেরা যেন নির্দ্বিধায় চলে যায়। চিকিৎসা হবে, নি-খরচায় ওষুধ মিলবে। আর কারো বেশি অসুখ হলে কষ্ট করে ক্যাম্পে যাওয়ার দরকার নেই। খবর পেলে সে-ই ঘরে এসে রোগী বা রোগিণী দেখে যাবে।

এদের খুশির, হাব-ভাব দেখে শর্মিলার মনে হচ্ছিল, অসুখ না হলেও তারা ক্যাম্পে ছুটে যেতে প্রস্তুত। আশ্চর্য, পরদিন থেকে শুধু চিকিৎসা দেখার জন্যেই কাছে দূরের কত মানুষ যে যেতে আসতে লাগল ঠিক নেই।

খুশি মুখে ডক্টর ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন, তুমি এসেই বাজী মাত করেছ।

একমাত্র অসুবিধে ছেলের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলটা বেশ দূরে। সব থেকে নিচু জায়গায় কামেং নদীর ধারে দিরাং-এর বড় মিলিটারি

ক্যাম্প আর কোয়ার্টার্স। স্কুলও সেই ক্যাম্পের কাছাকাছি। হাঁটতে হলে কম করে ছ' মাইল পথ। মিলিটারি চাকুরেদের ছেলে-মেয়েরা আর পদস্থ অসামরিক কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েরাই শুধু ওই স্কুলে পড়ে, তা নয়। সকলের জন্যেই অবারিত ওই স্কুল। বেতন লাগে না, ছাত্রছাত্রীদের বইপত্র যোগানোর দায়িত্ব পর্যন্ত সরকারের।

যাতায়াতের ব্যবস্থাও ডক্টর ভট্টাচার্য অনায়াসেই করে দিলেন। ভালো ডাক্তার হিসেবে ওই মিলিটারি এলাকায়ও তাঁর কদর আর সমাদর খুব। কারো একটু বেশি অসুখ-বিসুখ করলে সেখানকার বুড়ো ডাক্তারও তাঁকে ডেকে পাঠায়। এখানকার সব পথেই মিলিটারি জিপ ট্রাক হামেশাই যাতায়াত করে। ওই স্কুলের অসামরিক নাগরিকদের ছেলে-মেয়েদেরও ওই মিলিটারি ট্রাক বা জিপ ভরসা। স্কুলের শুরু আর ছুটির সময় দু-তিনটে মিলিটারি গাড়ি ছেলে আনা আর পৌঁছে দেওয়ার কাজ করে। ডক্টর ভট্টাচার্য বাবুলকে স্কুলে ভর্তি করে সেই দিনই এক পদস্থ মিলিটারি অফিসারের সঙ্গে কথা বলে ওকে আনা-নেওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলল। শর্মিলাও সঙ্গে ছিল। ,এখানেও মিলিটারি স্টাফের অনেকেই সাগ্রহে তার সঙ্গে আলাপ করল। আর জোয়ান পাঠিয়ে ছেলেকে জিপে আনা-নেওয়ার ব্যাপারে সকলেই তাকে নিশ্চিন্ত করল। স্কুলের সময় যে জিপই ওদিক দিয়ে আসবে, ছেলেকে নিয়ে আসবে। আর বিকেলে, অর্থাৎ স্কুলের ছুটির সময় কত জিপই তো ওই পথে যায়। তারা আশ্বাস দিল, ডাক্তার মিসেস হাজারিকার কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না।

কামেং নদীর ধারের মিলিটারি বেস তেমন বড় ব্যাপার কিছু নয়। এখানকার মিলিটারিদের রাস্তা মেরামত, তদারক আর কাছে দূরে কনস্ট্রাকশনের কাজ বেশি। তাই অসামরিক পর্যায়ের মানুষদের সঙ্গে এখানকার এদের বেশি যোগ। তারা সাহায্য করেই থাকে। সমস্ত অরুণাচলের মিলিটারি বিভাগের এটাই বৈশিষ্ট্য। জনসাধারণ

বহু ব্যাপারে তাদেরই মুখাপেক্ষী। তাদের সাহায্য ভিন্ন অনেক ব্যাপারে সাধারণ মানুষ অচল। অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আর নিষিদ্ধ এলাকাগুলোর কথা স্বতন্ত্র। সে-সব জায়গার কড়াকড়ি অন্যরকম।

তবু ছেলের ব্যাপারে এই ব্যবস্থা শর্মিলার একটুও পছন্দ হল না। পছন্দ না হওয়ার কারণ ও নিজেই জানে। কিন্তু মুখ ফুটে কাউকে সেটা বলেই বা কি করে? হাল ছেড়ে শেষে ওপরঅলার ওপরেই নির্ভর করে। ওর নিজের ইচ্ছেয় কিছু হয়নি। হচ্ছে না। ভেবে কি করবে, আজে বাজে চিন্তা মাথায় আসে বলে নিজের ওপরেই বিরক্ত। স্কুলে যাকে ভর্তি করা হয়েছে, সকলের কাছে সে ডাক্তার মিসেস হাজারিকার ছেলে বাবুল হাজারিকা। ও আগ বাড়িয়ে কাউকে কিছু জানান না দিলে কার কি জানার আছে, বোঝার আছে। বিরক্তির আরো কারণ, ভীরুতা বা দুশ্চিন্তার দরুন অপরাধ বোধ। শর্মিলা কি কারো ছেলেকে চুরি করে বসে আছে যে এত ভাবনা। উল্টে তো দিলীপ ডেকা নামে কোনো এক অদেখা মিলিটারি এনজিনিয়ারকে দেখার বা জানার কৌতূহল যে মনে মনে আছে, তাও তো মিথ্যে নয়। সেই লোক মেঘালয়ে একলা গেছল বাড়ি ঘর বিক্রী করতে। এমনও তো হতে পারে সব শোক ভুলে ওই লোক তার ঢের আগেই আবার বিয়ে থা করে সংসার পেতে বসে আছে। আর এ-ও হতে পারে তিন মাসের মধ্যে অরুণাচল ছেড়ে ওই লোক আবার কোথাও বদলী হয়ে চলে গেছে।

কাজে ডুবে না গেলে এখানে সময় কাটানো দুর্ভর। আর কাজ করলে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ফুরসৎ মিলবে না। দু' মাসের মধ্যে শর্মিলা একটা জিনিস এখানে আবিষ্কার করল, যা ডক্টর ভট্টাচার্যেরও এতদিনের মধ্যে খুব গোচরে আসেনি। সেটা মেয়েদের একটা খারাপ রোগ, যা পুরুষ সংসর্গ থেকেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মেয়েদের দেহে আসে। মেয়ে ডাক্তার পেয়ে গ্রামের অনেক মেয়ে,

তাকে বিশ্বাস করে গোপন ব্যাধির কথা জানিয়েছে। ক্রমশ বহু বয়স্কা মেয়েরও এই রোগের প্রকোপ দেখে শর্মিলা ডক্টর ভট্টাচার্যের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করেছে। শুনে ডক্টর ভট্টাচার্য নির্বাক খানিকক্ষণ। তার পরে বলল, এখানকার অনেক মেয়ের এই রোগের কথা কানাঘুষায় সে অনেক বার শুনেছে। কিন্তু ওদের পুরুষেরা এ-ব্যাপারে চুপ। বেশি বাড়াবড়ি হলে আভাসে ইঙ্গিতে দু-চার কথা বলে তাদের পুরুষেরা ওষুধ নিয়ে যায়। আর তাকেও আন্দাজেই ওষুধ দিতে হয়।

ডক্টর ভট্টাচার্য বলল, মিলিটারিতে ছাওয়া এই দেশের এটাই একটা বড় অভিশাপ দেখছি। এখানকার পুরুষদের সব থেকে বেশি ভোলানো যায় ভালো মদের লোভ দেখিয়ে। ভালো মদের টোপ পেলে সাময়িকভাবে অনায়াসে এবা ঘরের বউ মেয়েদেব সাময়িক ফুর্তির জন্য যার-তার হাতে ছেড়ে দিতে পারে। ডক্টর ভট্টাচার্য শুনেছে, এই মদ ভেট দিয়ে কিছুদিন আগেও মিলিটারির লোকেরা গাঁয়ে হানা দিয়ে ইচ্ছে মতো ফুর্তির মেয়ে জোটাতো। সেই থেকেই এই রোগের সূত্রপাত। তবে এ-ব্যাপারে ইদানীং অনেক কড়াকড়ি হয়েছে। তবু লুকিয়ে চুরিয়ে কোথায় কি হচ্ছে কে তার খবর রাখে।

এ-খবর জানার পর মিলিটারির সকলের প্রতিই একটা বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হতে থাকলো শর্মিলার মনে তাদের সাহায্যে ছেলের স্কুলে যাতায়াতও বরদাস্ত করতে চায় না। নিজের গাড়িটা বেচে দিয়ে এসেছে। এখানে নতুন গাড়ি কেনার কোনো প্রশ্ন নেই। সরকারি বিভাগের গাড়ি অনেক সময় অকশনে বিক্রী হয়। পছন্দ মতো একটা পেলে কেনার কথা ডক্টর ভট্টাচার্যকে বলেছে। এ ভদ্রলোক আবার এ-সব পাহাড়ী রাস্তায় শর্মিলার গাড়ি চালানো প্রস্তাব কানে তুলতেই রাজি নয়। শুধু বলেছে, বর্ষাটা দেখো, তারপর গাড়ি চালানোর কথা ভেব।

জুনের মাঝামাঝি সেই বর্ষা এলো। এবারে দেরিতেই এসেছে নাকি। চলবে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত। তার পর শীত। গোড়া থেকেই স্নো লাইন দেখা দেবে। চার হাজার ফুটের ওপর থেকে রাস্তা-ঘাট-পাহাড় সব বরফে ছেয়ে যাবে। মিলিটারির ট্রেকিং কার ছাড়া ভরা শীতে চলাফেরাও নিরাপদ নয়।

এই তিন মাসে শর্মিলা বারতিনেক বমডিলা গেছে। ডক্টর ভট্টাচার্য পাঠিয়েছে। ওখানকার বড় হাসপাতাল তাদের মাদার সেন্টার। ওষুধ-পত্রের চাহিদা বাড়ছেই। মেয়েদের যে বিশেষ চিকিৎসার জন্য শর্মিলা উঠে পড়ে লেগেছে, তার জন্যেই বাড়তি অনেক হাজার টাকার ওষুধ দরকার হয়। ডক্টর ভট্টাচার্যের সুপারিশ নিয়ে টাকা আর আনুষঙ্গিক সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে এক একবার ট্রাক বোঝাই ওষুধ নিয়ে ফিরতে হয়। স্বীকার করতে হবে, এ-সব ব্যাপারে সরকারি দাক্ষিণ্যের কার্পণ্য নেই।

এই বর্ষার মুখেই একটা বড় রকমের ফ্যাসাদে পড়ল শর্মিলা। আর সেই থেকেই জীবনের পট পরিবর্তন আবার।

ছেলেটা হঠাৎ অসুখে পড়ল। প্রায়ই ঘুষঘুষে জ্বর হচ্ছে। মাঝে মাঝে আবার চার পাঁচ ডিগ্রী জ্বর এসে যায়। ওর চিকিৎসার ভার ডক্টর ভট্টাচার্যই নিয়েছে। অসুখটা ঘোরালো হয়ে উঠতে শর্মিলা ঘাবড়েই গেল। খুব ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে ডক্টর ভট্টাচার্য এমন এক ওষুধের কথা বলল, যা দিরাং-এর কোথাও অন্তত পাওয়া সম্ভব নয়। বিদেশী ওষুধ। ডক্টর ভট্টাচার্য শর্মিলাকে পরদিনই ভোরে জিপ নিয়ে বমডিলা চলে যেতে বলল। সেখানে এ-ওষুধ পাওয়া যায় তিনি জানেন। সেখানকার হাসপাতালেও টেলিফোন করে জেনেছে তাদের কাছে ওষুধ নেই বটে, তবে খুঁজলে পাওয়া যাবে—এ-আশ্বাস তারাও দিয়েছে।

শর্মিলা সকাল আটটার মধ্যে জিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। বুড়ো ড্রাইভারটা শর্মিলাকে ভারি পছন্দ করে, তাকে মা বলে ডাকে

সে ভরসা দিয়েছে, বর্ষার দরুন কোথাও পুলটুল ভেঙে না পড়লে, বড় কিছু গণ্ডগোল না হলে, বেলা বারোটার মধ্যেই খোকার ওষুধ যোগাড় করে চলে আসবে। আর ডক্টর ভট্টাচার্য আশ্বাস দিয়েছে, শর্মিলা না ফেরা পর্যন্ত তার ক্যাম্পে বাবুলের কাছে থাকবে, এখান থেকেই সকালের রোগী দেখবে।

যাবার আগে একটা পঁয়ষট্টি হাজার টাকার চেক ক্যাশ করার অথরিটি ধরিয়ে দিয়েছে। বমডিলার সরকারি ব্যাংক থেকে এ-টাকাটা ক্যাশ করে আনতে হবে। ফ্রন্ট লাইনে তাঁর তৃতীয় ক্যাম্প তৈরির কাজ বর্ষার আগেই প্রায় শেষ। পেমেন্ট, মাইনে-পত্র ইত্যাদির জন্য টাকার দরকার। বমডিলার হাসপাতালে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের চেক পড়ে আছে। সেটা এই সঙ্গে ক্যাশ করে আনা। এত টাকা না হোক, ডক্টর ভট্টাচার্যের অথরিটি নিয়ে মাসিক বরাদ্দের চেক শর্মিলা আগেও একবার ক্যাশ করে এনেছে। গেজেটেড অফিসার তো সে-ও, অসুবিধের কিছু নেই।

সকাল থেকেই আকাশের লক্ষণ ভালো ছিল না। ঝমঝম বৃষ্টি তো থেকে থেকে লেগেই আছে। তার থেকেও ভয়ের কথা, মাঝে মাঝে ঝড়ো বাতাস দিচ্ছে। এই বাতাসই রুদ্র মূর্তি ধরলে রাস্তাঘাট খারাপ করে দেয়, ত্রাসের কারণ হয়। কিন্তু জিপের বুড়ো ড্রাইভার জানে, খোকার কঠিন ব্যামো, ওষুধ চাই-ই। তাই বার বার সে আশ্বাস দিয়েছে, ঈশ্বরের দয়ায় কোনো বিঘ্ন হবে না, ওষুধ নিয়ে ঠিক চলে আসা যাবে।

দিরাং থেকে বমডিলা দু'হাজার ফুট চড়াইয়ের পথ। অনেক জায়গাতেই বড় বড় পাথর খসে রাস্তা আটকে আছে। বয়েস হলেও ড্রাইভার লোকটা অসুরের শক্তি ধরে। তাছাড়া আসার সময় পাথর সরানোর সরঞ্জাম সে সঙ্গে করেই এনেছিল। পাঁচ সাত মণ ওজনের পাথর সরিয়ে রাস্তা করা এ-সময় নতুন কিছু নয়। কেবল ভয়, পাহাড়ের ঝোরায় ব্রিজ না ভাঙা দেখে কোথাও। তারও সম্ভাবনা

বমডিলার রাস্তায় অবশ্য কম। কারণ বর্ষা নামার আগেই ব্রিজ পরীক্ষা আর মেরামতের কাজে মিলিটারি তৎপর হয়ে ওঠে।

সকাল আটটায় বেরিয়েছিল, ছোটখাটো অনেকগুলো বিঘ্ন কাটিয়ে বমডিলা পৌঁছুতে বেলা সাড়ে এগারোটা বেজে গেল। কিন্তু তার আগে থেকেই বুড়ো ড্রাইভারের মুখ কালো। পাহাড়ী চড়াইয়ের পথে বেশির ভাগ সেকেণ্ড গীয়ারে গাড়ি চলে। তাতে কোথায় যেন অসুবিধে হচ্ছিল, সহজে গীয়ার দেওয়া যাচ্ছিল না। ফার্স্ট গীয়ারেও অনেকবার আটকাচ্ছে আর শব্দ হচ্ছে। শর্মিলা উতলা মুখে অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছে, কি অসুবিধে হচ্ছে?

ড্রাইভার মুখে কিছু বলে না, কিন্তু তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল ব্যাপার সুবিধের নয়। বমডিলা পৌঁছে স্বস্তি। হাসপাতাল সেখান থেকে মাইল দেড়েকের মধ্যে। কিন্তু তখনই বিভ্রাট।

জিপ অচল। গীয়ার দিতে গিয়ে একটা প্রচণ্ড শব্দ হয়ে গাড়ি থেমেই গেল।

পুরো দস্তুর শহর তাই রক্ষা ভাবছে শর্মিলা! রাস্তার লোককে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, মিনিট দশেকের পথ জিপ ঠেলে নিয়ে গেলে ভালো মোটর গ্যারাজ আছে। তাই চলল। ড্রাইভারের সাহায্যের জন্য আরো লোক জুটে গেল। এদিকে আবহাওয়ার অবস্থা তখনই বেশ ঘোরালো। শীত নামিয়ে দিয়েছে। তার মধ্যে অভিজ্ঞ বুড়ো ড্রাইভারের যা সন্দেহ, তাই যদি হয়ে থাকে তো সমূহ সঙ্কট। ড্রাইভার বলছিল, খুব সম্ভব চড়াইয়ের মুখে ক্রমাগত চাপ পড়ার দরুন পুরনো জিপের কাউন্টার পিনিয়ন ভেঙ্গে গেছে। তাই যদি হয় তো গীয়ার বক্স খুলে সে-সব ঠিক করা কম করে দেড়-দু' দিনের কাজ।

গ্যারাজের মেকানিক জানালো তাই হয়েছে। এখন থেকে কাজ শুরু করলে পরদিন বিকেল নাগাদ সে গাড়ি দিতে পারবে। তার আগে নয়।

ঘড়িতে বারোটা বাজে। শর্মিলার ভাবনা চিন্তার অবকাশ নেই। এক অচেনা লোকের গাড়ি থামিয়ে হাসপাতালে পৌঁছুলো। সেখান থেকে ঘণ্টা দুইয়েব কড়াবে একটা ভ্যান সংগ্রহ করা গেল। আকাশেব দুর্যোগ বেড়েই চলেছে। হাসপাতাল থেকে দিরাং-এ ফোনে কানেকশন পেতে চেষ্টা কবে জানলো, দুর্যোগে ওদিকের সমস্ত লাইন খাবাপ হয়ে গেছে।

প্রথমেই চেকটা সংগ্রহ কবে ব্যাংকে ছুটল টাকা তুলতে। টাকা নেবাব জন্য সঙ্গে ডাক্তাবিব পেট-মোটা ব্যাগটা খালি কবে এনেছিল। ডক্টব ভট্টাচার্য বলে দিযেছে, হাজাব পনেবব দশ টাকাব নোট নিতে, আব বাকি পঞ্চাশ হাজাব একশ টাকাব নোট নিলেই হবে। তাব মানে দশ টাকাব পনেবটা বাণ্ডিল, আব একশ টাকাব পাঁচটি।

টাকা ব্যাগে পুরে পিছন ফিবতে দেখে, একটা লোক তার দিকেই চেয়ে আছে। লালচে মুখ। নাকেব নিচে খুব ছোট আর খোঁচা খোঁচা গোঁফ। দাঁতেব ফাঁকে সরু চুরুট। মাথায বাবারের টুপী, গাযে চামড়াব আঁট জামা। তাব ওপব বুক খোলা পা পর্যন্ত পাতলা বাবাবে মোড়া ওভাবকোট। লোকটা বেজায ঢ্যাঙা আর তেমনি মজবুত স্বাস্থ্য।

শর্মিলাব লক্ষ্য কবাব কোনো হেতু নেই তবু লক্ষ্য করল, কাবণ দু'হাত তফাতে দাঁড়িয়ে লোকটা যেন নির্লিপ্ত মুখে তার দিকে চেয়ে দ্রষ্টব্য কিছু দেখছে। গৌহাটি থাকতেও পুরুষেব এই দেখাটা তার গা সওয়া হয়ে গেছল। মুখে একটা বিবক্তিব ছাযা ফেলে চটপট বেরিয়ে এসে ভ্যানে উঠল। তাবপব দেখল, লোকটা ঘুরে তার দিকেই চেয়ে আছে। বেরিয়ে আসাব সময় শর্মিলার মুখে বিরক্তির ছায়া একটু বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, হযতো তাই সম্ভবত।

ওষুধও সংগ্রহ হল। তারপর হাসপাতালেব ডাক্তারদের সঙ্গেই লাঞ্চ সারল। ঘড়িতে বেলা দুটো তখন। এবারে ফেরার তাগিদ। বড় ডাক্তারকে ছেলের অসুখের কথা বলে যেভাবে হোক ওর

ফেরার ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানালো।

একমাত্র ভরসা, কোনো মিলিটারি গাড়ি যদি সেদিকে যায়। যোগাযোগ করে বড় ডাক্তার জানালো, একটা ট্রাক যাবার কথা আছে, কিন্তু দুর্যোগ দেখে যাবেই যে নিশ্চয় করে বলা যায় না। ঝড়ো বাতাস আরো বাড়তে থাকলে হয়তো যাওয়া হবে না। মিলিটারি ট্রাক যেখান থেকে রওনা হবে, সেখানে অপেক্ষা করা আর তাদের মর্জির ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই।

যে গ্যারাজে শর্মিলার জিপ মেরামত হচ্ছে তার উল্টো দিকের পয়েন্ট থেকেই সব গাড়ি দিরাং-এর পথে রওনা হয়। সেখানে মিলিটারি ট্রাকটা দাঁড়িয়ে, জনাকতক অফিসারও। তাদের সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল দুর্যোগ দেখে তারাও দোটানায় পড়েছে। এ-রকম থাকলেও যাওয়া যাবে, কিন্তু আরো খানিকক্ষণ না দেখে রিস্ক নিতে চায় না।

শর্মিলা এমন সংকটে আর বুঝি জীবনে পড়েনি। সকালেই ছেলেটার তিনের ওপর জ্বর দেখে এসেছে, কেমন আছে এখন কে জানে। ওষুধটাও এই সময়ের মধ্যে পড়বে আশা করেছিল। কিন্তু এদিকে যা অবস্থা, সমস্ত রাতেও পড়বে কিনা ঠিক কি।

রাস্তা পেরিয়ে গ্যারাজের দিকে আসতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ব্যাংকের সেই লোকটা। সকালের সেই পোশাক। গ্যারাজ থেকে হাত কুড়ি দূরে একটা টিনের শেডের নিচে দাঁড়িয়ে সরু চুরুট টানছে। তার দিকেই চেয়ে আছে।

শর্মিলা গ্যারাজে তার ড্রাইভারের কাছে এলো। গাড়ির কাজ ধরা হয়েছে বটে, কিন্তু গীয়ার বক্স খুলে যা দেখা গেছে তাতে কালকের মধ্যেও জিপ হাতে পাবে কিনা সন্দেহ।

শর্মিলা আকাশ দেখছে, মাঝে মাঝে রাস্তা পেরিয়ে এসে মিলিটারি অফিসারের সঙ্গে কথা বলছে, আবার ফিরে গ্যারাজে এসে বসছে। ভিতরের ছটফটানি গোপন থাকছে না খুব। এরই

মধ্যে অদূরের ওই রাবারের টুপী আর চামড়াব জামা-পরা ঢ্যাঙ্গা লোকটার সঙ্গে বাব কয়েক চোখোচোখিও হয়েছে। লোকটা চেয়েই আছে আর চুরুট টানছে। এ ছাড়া আব কোনো অভিব্যক্তি নেই। তবু চোখোচোখি হলে বিবক্তি বাড়ছে শর্মিলাব। এখন সবেতে বিরক্তি।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পাব হতে চলল। আকাশেব একই অবস্থা। সেই রকমই বৃষ্টি আব শাঁ-শাঁ বাতাস। বাগই হচ্ছে শর্মিলার। সাহস করে বওনা হয়ে পড়লে এতক্ষণে দিবাং পৌঁছে যাওয়ার সময় হত।

আবাব এক দফা ওই অফিসাবদের একজনেব সঙ্গে খানিক কথাবার্তা বলে বাস্তা পাব হতে গিয়ে শর্মিলাব চোখে পড়ল, চুরুট মুখে লোকটা বাস্তা পাব হয়ে এদিকে আসছে এবাব। তার দিকে না তাকিয়ে শর্মিলা গ্যাবাজে এসে দাঁড়াতেই জিপেব বুড়ো ড্রাইভার তার কাছে এসে জানালো, ওই ঢ্যাঙা লোকটা গ্যারাজে এসে খোঁজ করছিল, জিপেব কি হযেছে, কাব জিপ, মেমসাহেব কোথায় যাবে, কি করে, এইসব। বুড়ো ড্রাইভার দু' কথায় জবাব দিয়েছে, মেম-সায়েব দিবাং ক্যাম্পের মস্ত ডাক্তার, দরকারি ওষুধ নিতে এসেছিলেন, তাই ছেলের বাড়াবাড়ি অসুখের জন্য এতটা ফেরার তাড়া। হঠাৎ এমন গায়ে-পড়া হয়ে খোঁজ-খবর নেবার জন্যেই ড্রাইভারের ভালো লাগছে না। মেম-ডাক্তারের সঙ্গে অনেক টাকা থাকবে বলে ভট্টাচার্য সাহেব ওকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন—তাই তার দুশ্চিন্তা। গ্রামে এ-সব ভয় কিছু নেই, কিন্তু শহরে কত রকমের লোক কত ধান্ধায় ঘোরে তার ঠিক কি।

শর্মিলা ফিরে দেখল লোকটা অদূরের শেডটার দিকে চলে যাচ্ছে। ওদিকেই দু-তিনটে মিলিটারি ট্রাক দাঁড়িয়ে। শর্মিলার ঘাবড়াবার কারণ নেই। ট্রাক যদি যায়ই, মিলিটারি অফিসাররা তো সঙ্গে থাকবেই। তারা ওকে ক্যাম্পে পৌঁছে দিয়েই দিরাং-এর

ক্যাম্পে চলে যাবে। ড্রাইভারের কথা শুনে শর্মিলার মনে হল, লোকটা স্পাই-টাই হবে। অরুণাচলের সমস্ত বড় বড় শহরেই স্পাই ছেয়ে আছে শুনেছিল। নানা কারণে এই সতর্কতা।

একটু বাদেই একজন জুনিয়ার অফিসার ছুটে এসে শর্মিলাকে ডাকল, এক্ষুণি ট্রাক ছাড়বে, এক্ষুণি তাকে ওই ট্রাকে গিয়ে উঠতে হবে। শেডের কাছে যে দু-তিনটে ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিল, তার একটা দেখিয়ে দিল।

হন্তদন্ত হয়ে শর্মিলা পেটমোটা ব্যাগ হাতে রাস্তা পেরিয়ে ট্রাকের কাছে চলে এলে। ড্রাইভারের পাশে মিলিটারিদের মধ্যে যে বেশি পদস্থ সেই বসে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মহিলাকে একটু সম্মান দেখানো হল। অবশ্য অন্যের সাহায্য ছাড়া তাদের পক্ষে উঁচু ট্রাকের পিছনে ওঠাও শক্ত। সেই জুনিয়ার অফিসারটিই তাঁকে সামনে ড্রাইভারেব পাশে বসতে বলল।

শর্মিলা লক্ষ্য করল, চুরুট মুখে সেই লোকটা একজন মিলিটারি অফিসারের সঙ্গে কথা কইছে। এ-রাজ্যে নাগরিকদের লিফট দেওয়ার রেওয়াজ আছই। শর্মিলা ধরেই নিল লিফট চাইছে। সাত আটজন সাজপোশাক পরা মিলিটারি অফিসার পিছনে উঠেছে, ভয়ের কোনো কারণই নেই। তবু লোকটাকে নাকচ করলে শর্মিলা খুশি হতো। কিন্তু সবার শেষে তাকে উঠতেই দেখল।

ট্রাক ছাড়ল। রাস্তার অবস্থা ভালো নয়। অনেক জায়গায় গাছ ভেঙ্গে রাস্তা জুড়ে আছে। পাথরের চাঁইও পড়ে আছে। সে সব পরিষ্কার করে সামনে এগনোর ব্যবস্থা মিলিটারি ট্রাকে এ-সময় সর্বদাই মজুত থাকে।

বাধা ঠেলে এগুতে খুব একটা সময়ও লাগে না। কিন্তু যত এগোচ্ছে শর্মিলার মনে হচ্ছে ঝড়ো হাওয়া বাড়ছেই। গরম জামা আর গরম জ্যাকেট ফুঁড়ে এই বাতাস যেন ঠাণ্ডা দাঁত বসাচ্ছে গায়ে। মাথা ঢাকার জন্য গরম চাদর সঙ্গে এনেছিল। সেটা দিয়ে মাথা

কান মুখ জড়িয়ে বসে আছে। তবু বাইরের জলের কণা যেন ছুঁচের মতো মুখে বিঁধছে এক একবার।

এই দুর্যোগ দেখে বুকের তলায় কাঁপুনি ধরেছে শর্মিলার। কেন মিলিটারির লোকগুলো ট্রাক ছাড়তে ইতস্তত করছিল তা যেন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে। সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ রেখে ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছে। জলে আর তার থেকেও বেশি বাতাসের দাপাদাপিতে সামনে দশ হাতের ওধারে সব ঝাপসা। তারই মধ্যে দিনমানে হেডলাইট জ্বেলে ট্রাক নামছে। শর্মিলার কেবলই মনে হচ্ছে, এই বুঝি ট্রাক থেমে গেল, এই বুঝি লোকটা ওর পিছনের কর্তাদের বলবে, আর এগনো সম্ভব নয়।

এই ধুকপুকুনি নিয়ে চার ভাগের তিন ভাগ পথ পার হয়ে এলো। ঝড়ো বাতাস একভাবেই বইছে। শর্মিলা ঘড়ি দেখছে, আর ট্রাকের মাইলের কাঁটা দেখছে।

·· আর পাঁচ মাইল।

তারপরেই আর্ত ত্রাসে শর্মিলার গলা দিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এলো একটা।

ট্রাকটা থেমে গেছে। সামনে রাস্তা জোড়া ধস। আর তিন গজও এগোনোর উপায় নেই।

ঘড়িতে বিকেল পাঁচটা।

ঝড়ো বাতাসে একে একে সকলেই নামলো ট্রাক থেকে। শর্মিলাও। ওদের কথা থেকে বোঝা গেল খুব বেশি হলে ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে এই ল্যাণ্ডস্লাইড হয়েছে। ওদের আগে আর কোনো মিলিটারি ট্রাক আটকে গেলে অয়্যারলেসে খবর যেত। এসব দেখে ওরা অভ্যস্ত বোধ হয়। একজন মিলিটারি অফিসার ওকে হাসি মুখেই বলল, আপনার তাগিদে তখুনি বেরিয়ে পড়লে এই ধ্বস আমাদের ট্রাকের ওপর ভাঙত কিনা কে জানে।

অনেক চেষ্টায় অয়্যারলেসে বমডিলায় খবর পাঠানো হল। সেখান থেকে রেসকিউ কার এলে তবে উদ্ধারের অর্থাৎ ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন। অন্যথায় এই ট্রাকে রাত কাটানো ছাড়া গতি নেই। রেসকিউ কার এই দুর্যোগে পাঠানো সম্ভব হবে কি হবে না এ কেউ বলতে পারে না। দ্বিতীয় কথা পেছনে আর কোথাও ধস নেমেছে কিনা কে জানে?

শর্মিলা কি করবে এখন? তার কেবলই মনে হতে লাগল জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে পাঁচ মাইলের ফারাক। যে কোনো উপায়ে এই পাঁচটা মাইল অতিক্রম করে যেতে পারলে জীবন। না পারলে মৃত্যু। কার মৃত্যু? নিজের না ছেলের? দুজনেরই হতে পারে। ডক্টর ভট্টাচার্য কি বুঝে এই দুর্যোগ দেখেও সকালেই তাকে বমডিলা পাঠিয়েছে ওষুধ আনতে? পাঠিয়েছে কারণ, আর একটা দিনও সবুর করা নিরাপদ ভাবেনি। ধরে নিয়েছিল বেলা বারোটা একটার মধ্যে ও ফিরে আসবে, ওষুধ পড়বে। সমস্ত দিনই সেটা না পড়ার ফল কি দাঁড়াতে পারে? শর্মিলার হাত-পা অবশ। এত অসহায়, ও নিজেও যে একজন বিচক্ষণ ডাক্তার সেটা মনে থাকছে না। চোখের সামনে বিভীষিকা দেখছে।

...এদিকে রেসকিউ গাড়ি নাও আসতে পারে। এলেই বা কি বাবুলের জীবন তুচ্ছ করে বমডিলায় ফিরে গিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাবে? এমন প্রাণ না থাকলে কি হয়? রেসকিউ গাড়ি আসুক বা না আসুক, এই লোকগুলোর খুব একটা চিন্তাভাবনা দেখছে না। হাসছে, শিস দিচ্ছে, কথাবার্তা কইছে নিজেদের মধ্যে। এ-রকম বিপাকে পড়ে ওরা অভ্যস্ত বোঝা যায়। হৈ-হল্লা করে ট্রাকেই রাত কাটিয়ে দেবে। এরপর হয়তো মদ গিলতে বসবে। শর্মিলার ধারণা এই রসদ ওদের সঙ্গেই থাকে। এই মদ ভেট দিয়ে গ্রামের সহজ সরল কত মেয়েকে এরা বিষিয়ে দিচ্ছে ঠিক নেই। সেই মদ গেলার পর লোকগুলোর মতিগতি কি হবে কে জানে? নিজের দিকে

চেয়েও মৃত্যুর ছায়াই দেখছে শর্মিলা।

দুরন্ত সাহসে মন স্থির করে ফেলল শর্মিলা। যত দুর্যোগই আসুক পাঁচ মাইল ওধারের জীবনের পথেই এগোবে সে। উৎরাইয়ের পথে পাঁচটা মাইল কিছুই নয়। রাস্তার কিনারা দিয়ে ধস পেরিয়ে ওধারে চলে যাওয়াও কঠিন নয় লক্ষ্য করল। ওপরঅলা কি মুখ তুলে চাইল? বাতাসও হঠাৎ একটু কম। এটাই ভয়ের ছিল, নইলে বৃষ্টি মোটেই তোড়ে পড়ছে না।

ট্রাক থেকে নামার সময়েই রেনকোট গায়ে চাপিয়েছিল। পেট-মোটা ব্যাগটা হাতে নিয়ে অফিসারদের একজনকে ইশারায় ডাকল। বলল, ছেলের সংকটাপন্ন অসুখ, ওষুধ নিয়ে তাকে পৌঁছুতেই হবে, এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। এ-রাস্তা তার খুব চেনা। নিচের দিকে পাঁচ মাইল পথ সে অনায়াসে হেঁটে চলে যাবে।

অল্পবয়সী মিলিটারি অফিসারটি প্রবল আপত্তি জানালো। বলল, এটা অত্যন্ত বেশি রিস্‌ক নেওয়া হবে, ঝড় আরো বাড়ারই সম্ভাবনা, তখন সে পথ চলতেই পারবে না, আর গড়ানে পাথরে বা গাছের ভাঙা ডালপালায় আঘাত লাগলে কোথায় ছিটকে চলে যাবে ঠিক নেই।

ঠাণ্ডা মুখে শর্মিলা বলল, দুর্ভাগ্য হলে ল্যাণ্ডস্লাইডে ওই দাঁড়ানো ট্রাকও গুঁড়িয়ে যেতে পারে, সে যাবে স্থির করেছে, যাবে।

বিড়ম্বিত অফিসার সঙ্গীদের সঙ্গে সম্ভবত কথা বলার জন্য ওদিকে গেল। কিন্তু শর্মিলা আর দাঁড়ালো না। রাস্তার কিনারায় ধসের ফাঁক দিয়ে এদিকে চলে এলো। তারপর কনকনে জলো বাতাস উপেক্ষা করে জোরেই পা চালিয়ে দিল। তিরিশ চল্লিশ গজ এগিয়ে পিছন ফিরে তাকালো। বিকেল সোয়া পাঁচটার সময়েও পনের গজের ওধারে চোখ চলে না। কাউকে দেখতে পেল না। প্রাণের মায়া ছেড়ে কেউ আসবে মনে হল না। না আসাটাই যেন নিরাপদ।

দেহের আর স্নায়ুর সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে এগিয়ে চলল। বাতাস এখনো তেমন মারাত্মক রকমের জোরে বইছে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতি পদক্ষেপে প্রচণ্ড ধকল। এক একবার মনে হচ্ছে ওকে উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে। একদিকের পাহাড় ঘেঁষে চলেছে। কখনো পাথরের গায়ে হাত রেখে রেখে এগোচ্ছে। হাত মাত্র একটা খালি, অন্য হাতে মোটা ব্যাগ। ওই হাতটাও খালি থাকলে সুবিধে হত। অন্য হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে কোনরকমে পথ ভাঙছে। বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো যেন বড় বড় ছুঁচের মতো চোখে মুখে বিঁধে চলেছে। হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি লাগছে।

দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় মাইল দুই এসেছে। আর তিন মাইল বাকি। আর তিনটে মাইল কি এ জীবনে শেষ হবে ? চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ব্যাগে টর্চ থাকেই। টর্চটা জ্বেলে এক হাতে ব্যাগ আর ওটা ধরে এগোনোর চেষ্টার বিরাম নেই।

কিন্তু আর বুঝি পারা গেল না। ঝড়ো বাতাসের বেগ হঠাৎই বাড়ল আবার। শর্মিলা সোজা হয়ে দাঁড়ালে টাল রাখতে পারছে না। যে কোনো একটা গাছ মাথার ওপর ভেঙ্গে পড়তে পারে, যে কোনো মুহূর্তে পাথর খসে ওকে চুরমার করে দিতে পারে। তবু ওই পাথর ধরে ধরে তিন চার পা এগোচ্ছে, আবার একটা বড় পাথর ধরে বসে পড়ে দম নিচ্ছে। এক একটা বড় দমকা বাতাসের ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু এগোনো যায়।

এবারে একটা বড় পাথরের আড়াল দিয়ে বসেই থাকতে হল। বাতাসের তোড় এত বেশি যে ব্যাগ আর টর্চ হাতে এগোতে চেষ্টা করলে কোথায় ছিটকে চলে যাবে ঠিক নেই।

বসে আছে। কাল গুনছে। আশার কাল কি অন্তিম কাল জানে না।

হঠাৎ বিষম চমকে উঠল। ঝড়ো বাতাস আর বৃষ্টি ফুঁড়ে মস্ত টর্চের আলো। একেবারে দশ গজের মধ্যে। পরের মুহূর্তে

চক্ষু স্থির শর্মিলার। বুকের তলায় মুগুরের ঘা।

এখনো দুই দাঁতের ফাঁকে একটা সরু চুরুট জ্বলছে। রাবারের টুপি মাথায় আর চামড়ার জামার ওপর বাবার মোড়া ওভারকোট পরা সেই তামাটে বর্ণ ঢ্যাঙা লোকটা।

শর্মিলা যে পাথরটাকে আশ্রয় করে বসে আছে, সেই পাথরটা ভর দিয়ে সামনে দাঁড়াল লোকটা। মুখের ওপর টর্চ ফেলে অবস্থাটা বুঝে নিল। শর্মিলার ছোট টর্চ জ্বলছে, নিজের টর্চটা নেভালো। তখুনি স্পষ্ট ভারী গলায় লোকটা বলল ইউ আর এ ব্রেভ লেডি—ভেরি ভেরি ব্রেভ ইনডিড।

লোকটার ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসির রেখা যেন। চোখ দুটো মুখের ওপর আটকে আছে। সাহসিকতার জন্য ব্যঙ্গ করছে ওকে? আর নিজের সৌভাগ্যের কথা ভাবছে? এই জলে বাতাসে যা হয়নি, এখন তাই হচ্ছে। সমস্ত শরীরের রক্ত জল হয়ে যাচ্ছে। পাহাড় থেকে শর্মিলাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে টাকার ব্যাগ নিয়ে চলে গেলে এ দুনিয়ায় কোনদিন কেউ কিছু জানবে না। সকলে ধরে নেবে দুঃসাহসের খেসারত প্রকৃতি নিয়েছে। যেভাবে চেয়ে আছে অপলক, তার আগে অন্য নরকেও টেনে নিয়ে যেতে পারে ওকে।

—আপনার ছেলে খুব অসুস্থ শুনলাম, যার জন্য এভাবে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত—কি হয়েছে?

ভদ্রলোকের মতো কথা শুনে ধড়ে যেন প্রাণ এলো একটু। জবাব দিল, খুব কঠিন অসুখ, আমি নিজেও ডাক্তার, কিন্তু ছেলেকে ডক্টর ভট্টাচার্য দেখছেন।

ফাঁক পেয়ে ইচ্ছে করেই নিজেও যে ডাক্তার সেটা জানিয়ে দিল। পরক্ষণেই মনে পড়ল, জিপের বুড়ো ড্রাইভারের কাছ থেকে ওর পরিচয় আগেই জেনে নিয়েছে লোকটা।

ঝড়ো বাতাস থেকে বাঁচার জন্য যে পাথরে আধখানা আড়াল দিয়ে বসেছিল শর্মিলা, সেটাতেই ঠেস দিয়ে একেবারে কাছ ঘেঁষে

পা ছড়িয়ে বসল লোকটা। বসতে হলে অবশ্য এ-রকম বসা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু শর্মিলা আবারও কাঠ কয়েক মুহূর্ত। লোকটার মতলব যে ভালো নয়, সে প্রায় নিঃসংশয়। এখন দরকার শুধু অদম্য সাহস। সেটুকুই হাতড়ে বেড়াতে লাগল।

—কিন্তু যাবেন কি করে, ইউ আর অলরেডি হাফ ডেড।

ঠাণ্ডা গলায় শর্মিলা জবাব দিল, আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি ঠিক যাব। আপনিও এই দুর্যোগে বেরিয়ে পড়েছেন যখন, তাড়া আছে নিশ্চয়—আপনি চলে যান।

লোকটার চোখে-মুখে হঠাৎ কৌতুকের ছায়া একটু। —অ্যাফরেড অফ্ মি?

ঝাঁঝালো মুখে শর্মিলা জবাব দিল, ভয় পাওয়ার মতো মহিলা হলে সেবার কাজ্ নিয়ে এখানে আসতাম না বা এই দুর্যোগে বেরুতাম না। আপনি এভাবে এখানে বসে থাকলে আমার অসুবিধে হচ্ছে, নিজের কাজে চলে যান।

গম্ভীর মুখে আবার একটু হাসি খেলে গেল। নিভন্ত চুরুটটা দাঁতে চিবুচ্ছে একটু একটু। বলল, আমার কাজ কিছু নেই, আপনাকে এভাবে বেরিয়ে পড়তে দেখে আমি সঙ্গ নিয়েছি। বাট আই মাস্ট সে ইউ হ্যাভ টেকন এ ডেসপারেট চান্স।

শর্মিলা ব্যাগটা হাতে নিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর পাথরে এক হাতের ভর রেখে রেখে এগোতে লাগল। তেমনি বাতাস, তেমনি ছুঁচের ফলার মতো বৃষ্টি।

লোকটাও সঙ্গ নিয়ে হাত বাড়ালো, ওই ব্যাগটা আমাকে দিন, তা না হলে পারবেন না।

শর্মিলা থমকে দাঁড়াল। রাগত স্বরেই বলে উঠল, প্লীজ ডোণ্ট ডিস্টার্ব মি। আমার সাহায্যের দরকার নেই—ইউ গো ইওর ওউন ওয়ে।

লোকটা জলে ভেজা মুখে হাসছে অল্প অল্প। দেখছে। বলল,

গোইং মাই ওয়ে ম্যাডাম—ঠিক আছে চলুন।

গা ঘেঁষেই পাশাপাশি আসছে। অবশ্য পাথরের দিক ঘেঁষে আসতে হবে এই ভয়াল অবস্থায়। কিন্তু আগে বা পিছনে এলে গা ঘেঁষে আসার দরকার হয় না। আরো কয়েক পা এগিয়ে শর্মিলা আবার দাঁড়িয়ে গেল। —আমার অসুবিধে হচ্ছে, আপনি টর্চ জ্বেলে আগে যান।

ক্রুদ্ধ স্বরেই বলেছে কথা ক'টা। পিছনে আসতে বললে অতর্কিতে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা, তাই সামনে যেতে বলেছে। কিন্তু লোকটার মুখও যেন কঠিন হঠাৎ। চাপা গর্জন করে উঠল, ডোণ্ট বি সিলি ম্যাডাম! আমার দিকে মন না দিয়ে সাবধানে পথ চলুন।

শর্মিলা কি করবে? নিজেই আগে আচমকা ধাক্কা মেরে লোকটাকে ফেলে দেবে? কিন্তু দুজনেই তো পাহাড়ের একদিকে দেয়াল ঘেঁষে চলেছে। কোথায় ফেলবে? কতদূর ফেলবে? কিন্তু তারপর কি হবে? এই লোকের মতলব তো আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

এগিয়ে চলল। কিন্তু একটু বাদে বাতাসের ঝাপ্টায় পাথরে ঠোক্কর' খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়েই যাচ্ছিল। লোকটা দু'হাতে ধরে ফেলল। হাতের ব্যাগ আর টর্চ মাটিতে ছিটকে পড়ল। ধরে ফেলা সত্ত্বেও পাশের পাথরে লেগে চোট পেল বেশ। লোকটা ধরে সেখানেই বসিয়ে দিল তাকে। ব্যাগটা হাঁ করে খুলে গেছে। টাকার তিনটে চারটে বাণ্ডিল পাথুরে রাস্তায় এসে পড়েছে। লোকটা ব্যাগ আর টাকা দেখল। তারপর নোটের ভেজা বাণ্ডিল ক'টা কুড়িয়ে ব্যাগে পুরে আবার বন্ধ করল। তার আগে ব্যাগ ভরতি টাকার অন্য বাণ্ডিলগুলোও দেখেছে। শর্মিলা জানে অত টাকা ব্যাগে পুরতে লোকটা সেই বমডিলার ব্যাংকেই দেখেছে। তবু মনে হল এখন ওর ভাগ্যের সবটাই এ-অজানা মানুষটার হাতের মুঠোয়। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় সপসপে জলে সমস্ত অস্তিত্ব থর থর করে কাঁপছে।

দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি লাগছে। এবার বুঝি আর জ্ঞানটুকুও ধরে রাখতে পারবে না শর্মিলা।

আবার তার গা ঘেঁষে বসেছে ওই লোক। মুখের দিকে চেয়ে তার অবস্থাও বুঝছে। ওভারকোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ছোট বোতল বার করল একটা। চোখ টান করে শর্মিলা দেখল, ব্র্যাণ্ডির বোতল। ছিপি খুলে তার মুখের সামনে ধরল। —হাঁ করুন।

—না, না। গলা দিয়ে অস্ফুট আর্তস্বর বেরিয়ে এলো শর্মিলার।

সঙ্গে সঙ্গে ভারী গলার অসহিষ্ণু গর্জন। --ইউ আর ভেরি ব্রেভ, বাট ডোণ্ট বি অ্যাবসার্ড মিসেস হাজারিকা! কথাব সঙ্গে সঙ্গে অন্য হাতে কাঁধ ধবে দু-তিনটে ঝাকুনি দিল। —টেক হার্ট, এ-পর্যন্ত যখন এসেছেন আপনাকে বাকিটুকুও যেতে হবে—হাঁ করুন, ইউ উইল ফীল বেটার।

কাঁধ ছেড়ে হাতটা এবাব একসঙ্গে দুই গাল বেড়িয়ে ধবে মাথা পিছন দিকে ঠেলে দিল। বোতলটা মুখে ঠেকিয়েছে। ওই হাতের জোরেই যেন হাঁ করালো ওকে। বোতলের জিনিস গলায় ঢেলে দিল খানিকটা। খানিকটা তরল জিনিস গলা বুক জ্বালিয়ে দিয়ে জঠরে নামতে লাগল। মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল। চোখেও অন্ধকার দেখল কয়েক মুহূর্ত।

বোতলটা এবার নিজের গলায় উপুড় করল লোকটা। শর্মিলা ঠিক দেখছে কিনা জানে না, ছোট বোতলটার চারভাগেব তিনভাগ শেষ মনে হল। নিজের সমস্ত শরীরটাও ঝাঁকিয়ে নিল এক প্রস্থ। বোতল বন্ধ করে পকেটে রাখল।

পাঁচ-সাত মিনিট কেটে গেল। বৃষ্টি বাড়ছে। বাতাস আরো বাড়ছে। শর্মিলার আরো কাছে ঝুঁকে দেখল। জিজ্ঞেস করল, ফিলিং বেটার?

বাইরে এত ঠাণ্ডা আর সর্বাঙ্গ জবজবে ভেজা সত্বেও ভিতরে সত্যি একটু উষ্ণ তাপ বোধ করছে শর্মিলা। এত ধকলে ওই পাতলা

বর্ষাতির ভেতর দিয়েই সর্বাঙ্গ ভিজেছে। তবে এখন সত্যিই ঠাণ্ডা লাগছে একটু। এই অবস্থায় ব্র্যাণ্ডি খেলে উপকার হবার কথাই। কিন্তু আপত্তি সত্ত্বেও যে-করে ওকে খাওয়ানো হল সেটাই বরদাস্ত করা কঠিন। তবু এই বিপাকে মাথা ঠাণ্ডা রাখাটাই সবার আগে দরকার। মাথা নাড়ল, একটু ভালো।

—দ্যাটস ফাইন। ইউ আর রিয়েলি ব্রেভ। আর মাত্র আড়াই মাইল পথ, আমি সঙ্গে আছি, কিচ্ছু ঘাবড়াবেন না। ছেলের অসুখের কথা ভাবুন ওষুধ নিয়ে পৌঁছুলেই হবে ভাবুন।

ভালো লাগল। এই প্রথম মানুষটার কথাগুলো ভালো লাগল শর্মিলার। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল। নির্ভর করতে ইচ্ছে হল। ভগবান! ওর যেন ভুল হয়ে থাকে, এই লোককে যা ভেবে বসে আছে তা যেন না হয়, এর মধ্যে যেন ঘাতক লুকিয়ে না থাকে।

আবার উঠল শর্মিলা। ওই লোকও উঠে দাঁড়িয়ে নিজের রাবারে মোড়া ওভারকোটটা গা থেকে খুলে ফেলল। শীতে দুই ঠোঁট অসম্ভব কাঁপছিল শর্মিলার। অনুমতির অপেক্ষা না রেখে সেটা কাঁধ বেড়িয়ে ওর গায়ে জড়িয়ে দিল। লোকটার গায়ে চামড়ার পোশাক। বেল্টের সঙ্গে চামড়ার কেসে রিভলবার। ওটা দেখে শরীরের রক্ত আবার হিম হবার দাখিল শর্মিলার। হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা নিতে যাবার আগে সে ওটা নিজের হাতে তুলে নিল। সেটার মুখ খুলে শর্মিলার ছোট টর্চটা তার মধ্যে ফেলে নিজের বড় টর্চটা ওর হাতে দিয়ে বলল, দেখে দেখে সাবধানে পা ফেলে চলুন, কোনো ভয় নেই।

এখানে দাঁড়িয়ে টাকার ব্যাগের জন্য আর ত্রাস দেখিয়ে লাভ নেই। অদৃষ্টে যা আছে হবে। লোকটার ডান হাতে ওর ব্যাগ, বাঁ হাতে ওর কাঁধ বেষ্টন করে এগোচ্ছে। শর্মিলার এক হাতে টর্চ অন্য হাতে পাশের বড় পাথরের দেয়াল ধরে ধরে এগোচ্ছে। তবুও থেকে থেকে পায়ে ঠোকর খাচ্ছে, এক-একবার পড়তে পড়তে

ওই লোকের জন্যেই সামলে নিতে পেরেছে। পিঠ বেড়িয়ে শক্ত হাতে কাঁধ ধরে আছে। জড়াজড়ি অবস্থায় পা ফেলতে হচ্ছে। অস্বস্তিতে ভেতর ছেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কাঁধ আর বাহু ছেড়ে দেবার কথা মুখ ফুটে বলতে পারছে না।

আর আধ মাইল এগোতে বাতাসের তোড় আরো বেড়ে গেল। বড় কোনো পাথরের আড়ালে আবার বসে না পড়লে এগোনো প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছে। আরো সমতল ভূমিতে আসার দরুন বাতাসের ঝাপটা আরো অসহ্য। ওই লোক নিজের দেহের সঙ্গে যেন এক হাতে আঁকড়ে নিয়ে পা ফেলছে। কাছে দূরে বড় বড় গাছের ডাল মড় মড় করে ভাঙ্গছে। যে-কোনো একটার আঘাতে সব শেষ হয়ে যেতে পারে। তবু বসতে চায় না শর্মিলা। একবার থামলে আর বুঝি চলতে পারবে না।

হঠাৎই কি হয়ে গেল শর্মিলা জানে না। পিছনের দিকে হাঁটুর ঠিক ওপরে কিসের একটা ঘা পড়ল। শর্মিলা মুখ থুবড়ে পড়ল। তারপর বাতাসের প্রচণ্ড ঝাপটায় পাথরের সঙ্গে ঠোকর খেতে খেতে গড়িয়ে চলল। হাতের টর্চটা আগেই ছিটকে পড়েছে। একটা হিম মৃত্যু বুঝি ওকে গ্রাস করতে আসছে।

শর্মিলা চোখ বুজে ফেলল। একটু বাদে কি কতক্ষণ বাদে চোখ মেলে তাকালো জানে না। অন্ধকারে তিন হাত দূরে দৃষ্টি চলে না। একটা বড় গাছের ডাল আঁকড়ে পড়ে আছে সে। শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। প্রলয় বাতাস।

সামনে বা পিছনে কোথাও সেই লোকের চিহ্ন নেই।

শর্মিলার তক্ষুনি মনে হল সবই গেছে। এবার জীবনও যাবে। প্রাণপণে একবার চিৎকার করে উঠল তবু, হোয়ার আর ইউ?

বাতাসে সেই চিৎকার নিজের কানেও পৌঁছল না। প্রাণপণ শক্তিতে শর্মিলা উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের ঘায়ে ওই প্রকাণ্ড গাছের ডালের ওপরেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বুকের কাছে

আর মাথার এক দিকে প্রচণ্ড একটা আঘাত লাগল এটুকুই শুধু মনে আছে।

তারপর আর কিছু মনে নেই। এক ভয়াবহ অন্ধকারের অতলে ডুবে গেল সে।

চোখ মেলে তাকিয়ে হঠাৎ দিশেহারা শর্মিলা। এ কি ব্যাপার। সে কি ভয়াল করাল স্বপ্ন দেখছিল কিছু? সবটাই দুঃস্বপ্ন? নিজের ঘরে নিজের শয্যায় শুয়ে আছে। পা থেকে গলা পর্যন্ত দুটো গরম কম্বলে ঢাকা। শয্যার দুদিকে ঝুঁকে বসে আছে ডক্টর ভট্টাচার্য আর পার্বতী। পাশের ছোট খাটে ছেলে শুয়ে ঘুমুচ্ছে।

শর্মিলা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। কিন্তু মাথায় বেশ যন্ত্রণা। বাইরে বাতাসের দাপাদাপি টের পাচ্ছে।

ডক্টর ভট্টাচার্য ব্যস্ত হয়ে আরো সামনে ঝুঁকলো। জিজ্ঞেস করল, কেমন লাগছে এখন?

সঙ্গে সঙ্গে সব-কিছু মনে পড়ল শর্মিলার। ঝড়, জল, বিভীষিকা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া। কিছুই স্বপ্ন নয়। কিন্তু ও তাহলে এখানে কেন? এই শয্যায় আশ্রয় পেল কেমন করে? ও কি করে এলো এখানে? সেই লোক কোথায়? টাকার ব্যাগ কোথায়?

ধড়মড় করে উঠে বসতে চাইল। ডক্টর ভট্টাচার্য আর পার্বতী দুজনেই বাধা দিল। পার্বতী জোর করেই আবার শুইয়ে দিল তাকে। তারপর ডাক্তারের কথা মতো গরম দুধের সঙ্গে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি মিশিয়ে খাওয়ালো ওকে। ডক্টর ভট্টাচার্য বলল, আজ আর কোনো কথা নয়, ব্যথার ওষুধ আগেই গুলে খাইয়েছি, এখন ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি—খেয়ে ঘুমোও।

কিন্তু শর্মিলার বুকের ভিতরে ধড়াস ধড়াস করছে। জিজ্ঞেস করল, রাত কত এখন?

হাত ঘড়ি দেখে, ডক্টর ভট্টাচার্য বলল, দেড়টা। সব ঠিক

আছে, কিছু চিন্তা কোরো না।

—টাকার ব্যাগ ?

ও-পাশের টেবিলের ওপরে ব্যাগটা দেখিয়ে ডক্টর ভট্টাচার্য বলল, ওই যে, টাকা সব ঠিক আছে—আমরা ঘরে আছি, রাতে আর কি হবে, ওখানেই থাক। দু'ঘণ্টা হল তোমার ছেলের ওষুধ পড়েছে, সে-ও ভালোই আছে—কোনো চিন্তা নেই।

শর্মিলার সব কিছু দুর্বোধ্য লাগছে এখনো। মাথাটা ভার। আর যন্ত্রণাও। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন নিজের নয়। ডক্টর ভট্টাচার্যের হাত থেকে ঘুমের ট্যাবলেট দুটো নিল, কিন্তু তখনই খেল না। জীবনে এমন দুর্বোধ্য ব্যাপার আর যেন কিছু ঘটেনি।

পার্বতীকে বলল, আমাকে আরো কিছু খেতে দাও, বড় খিদে পেয়েছে।

ডক্টর ভট্টাচার্য মাথা নাড়তে পার্বতী তক্ষুনি খাবার আনতে ছুটল। টোস্ট ভাজা তরকারি আর আরো এক পেয়ালা দুধ নিয়ে এলো। শর্মিলা উঠে বসল আস্তে আস্তে। যা আনা হয়েছে তার কিছুটা খেল। প্রতি মুহূর্তের কথা মনে পড়ছে এখন। শেষের বার পড়ে যাওয়ার পর আর কিছু মনে পড়ছে না।

দুধের পেয়ালাটা খালি করে ডক্টর ভট্টাচার্যকে বলল, এখন অনেকটা ভালো লাগছে, ঘুমের ওষুধ একটু বাদে খাচ্ছি। আপনি আগে বলুন সব, শেষবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছলাম—তারপর এ-দু'মাইল পথ এলাম কি করে।

ডক্টর ভট্টাচার্য জবাব দিল, বরাত জোরে যে লোককে সঙ্গে পেয়েছিলে সেই তোমাকে একেবারে এই ঘর পর্যন্ত দিয়ে গেছে—মেজর ডেকার মতো অমন অসম সাহসী মানুষ সঙ্গে না থাকলে আজ বাঁচোয়া ছিল না।

হৃৎপিণ্ডটাই বুঝি বিষম লাফিয়ে উঠল শর্মিলার। অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, মেজর ডেকা !

ডক্টর ভট্টাচার্য হাসল। মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, এনজিনিয়ার মেজর দিলীপ ডেকা—তুমি তাকে ডাকাত-টাকাত ভেবেছিলে শুনলাম।

পার্বতী গম্ভীর। শর্মিলা নির্বাক বিমূঢ়। প্রাণান্তকর দুর্যোগে এমন যোগাযোগের ব্যবস্থাই তাহলে ওপরঅলা করে রেখেছিল। শর্মিলা কি নিজের এই জীবন লাভের জন্য কাউকে ধন্যবাদ দেবে?

আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল, আপনি আগে চিনতেন তাঁকে?

—চিনব না কেন, গত একটা বছর তো সে এখানকার সমস্ত কন্সট্রাকশনের ভার নিয়ে এই কামেং ক্যাম্পেই ছিল। মাস তিনেক আগে নিজের ইচ্ছেয় পাসিঘাটে চলে গেছল। সেখান থেকে পাঁচ-ছ'দিন আগে বমডিলা এসেছিল—আজ দিরাং-এ আসার মুখে কেমন যোগাযোগ দেখো। এ ভেরি ভেরি গুডি ম্যান কিন্তু যেমন বুদ্ধি তেমনি সাহস। দেখ না, বমডিলা থেকে ট্রাক ছাড়ছিলই না ছেলের অসুখের জন্য ওষুধ নিতে এসেছে আর যাবার জন্য ছটফট করছে দেখে সেই ট্রাক ছাড়ার হুকুম দিল। ওর কথা তোমাকে পরে বলবখন আজ যে অবস্থায় তোমাকে নিয়ে এলো, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না—ওর দ্বারাই সম্ভব।

সেই অবস্থার কথাও কিছু বলল ডক্টর ভট্টাচার্য। রাত এগারোটায় পাঁজা কোলা অবস্থায় শর্মিলাকে নিয়ে মেজর ডেকা ক্যাম্পের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকেছে। সে এক বীভৎস মূর্তি। রক্তে নাক মুখ ভেসে যাচ্ছে। কপালের জায়গায় জায়গায় থেঁতলে গেছে। বারকতক পড়ে গিয়ে পায়েও বেশ চোট পেয়েছে। বেল্টের সঙ্গে পিছনে টাকার ব্যাগটা বাঁধা। পাগলের মতো টলতে টলতে অজ্ঞান অবস্থায় শর্মিলাকে ধুপ করে ফেলেই সটান মেঝের ওপর শুয়ে পড়েছে—কোমরে তখনো টাকার ব্যাগটা বেল্টের সঙ্গে বাঁধা। একসঙ্গে দুজনের শুশ্রূষা করতে হয়েছে ডক্টর ভট্টাচার্যের। শুশ্রূষা ওই লোকেরই বেশি করতে হয়েছে—কারণ তার হাতে পায়ে

মুখে সর্বত্র অনেক ক্ষত।

শুশ্রূষার ফাঁকে আধ বোতল ব্র্যাণ্ডি গলায় ঢেলেছে। তারপর ঘণ্টাখানেক তেমনি শুয়ে থেকেই কোথায় কি ঘটেছে, আর কিভাবে শেষ পর্যন্ত আসতে পেরেছে, বলেছে। কিন্তু এমন দুরন্ত মানুষ, ওই অবস্থাতেও রাতটার মতো তাকে ধরে রাখা গেল না। গা নাড়া দিয়ে উলঠ। আবার হাত ধরে টানাটানি সত্ত্বেও বলল, একেবারে ক্যাম্পে গিয়ে শোবে—এখানে গা ছেড়ে দিলে ক'দিনে উঠবে ঠিক নেই।

ধরে রাখা গেল না। চলেই গেল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল তখনো। বলে গেছে, ভালো থাকলে কাল পরশু এসে খবর নেবে। ডক্টর ভট্টাচার্য হেসেই বলল, যাবার আগে তোমার খুব প্রশংসা করে গেছে। বলেছে ট্রাক আটকে যেতে যেভাবে তুমি অত টাকা সঙ্গে নিয়ে একলা নেমে চললে যে মনে মনে সে নাকি তোমাকে সেলাম ঠুকেছে। এমন ব্রেভ লেডি আর নাকি দেখেনি।

ঘুমের ওষুধটা খেয়ে ফেলতে বলে ডক্টর ভট্টাচার্য উঠোন পেরিয়ে রোগী দেখার ঘরে রাতের মতো বিশ্রাম করতে গেল। তারও স্নায়ুর ওপর কম ধকল যায়নি।

ছেলেটা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। পার্বতী সামনের চেয়ারে বসে। সে বহীনজির দিকে চেয়ে আছে, আর শর্মিলা ওর দিকে।

কিন্তু এই রাতে আর কিছু ভাবতে পারছে না শর্মিলা। ভাবার সময় আরো অনেক পাবে। পাশের টেবিল থেকে জলের গেলাসটা টেনে নিয়ে ঘুমের ট্যাবলেট দুটো খেয়ে ফেলল। পার্বতীকে বলল, আলো নিভিয়ে দাও।

পর দিনও আকাশের চেহারা ঘোরালো। টানা আট দশ দিন অবিরাম বৃষ্টি নতুন কিছু নয় এখানে। রোগী এ-সময় আসেই না বলতে গেলে। কিন্তু শর্মিলা অবকাশ চায় না। কিছুই আর ভাবতে চায় না। কিন্তু হাতে কাজ না থাকলে চাক বা না চাক, ভাবনা ওকে ছাড়বে কেন? অবশ্য আজ রোগী এলেও ওর দেখার কোনো প্রশ্ন নেই। ডক্টর ভট্টচার্যের কড়া নির্দেশ, তিন দিন এখন শুধু টানা বিশ্রাম। পার্বতীকে তাই বলেছে, কম্পাউণ্ডার হানৃডিককেও তাই বলে রেখেছে।

আজও সর্বাঙ্গে ব্যথা শর্মিলার। কিন্তু শরীর সম্পর্কে সজাগ নয় একটুও। গতকাল সমস্ত দিন আর রাত্রি স্নায়ুর ওপর দিয়ে এক ধরনের ধকল গেছে। আজ অন্যরকমের টানাপোড়েন চলেছে। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত সর্বক্ষণ ওই একটা লোক যেন ছায়ার মতো মগজের সঙ্গে লেগে আছে। মেজর দিলীপ ডেকা। থেকে থেকে বাবুলের বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ও আজই অনেকটা সুস্থ। বিছানা থেকে নামার জন্য ব্যস্ত। আন্টি আর মা দু'জনের চোখ এড়িয়ে সেটা পারা যাচ্ছে না। কিন্তু মাকে বার বার ওর সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে আর ওইরকম চেয়ে থাকতে দেখে হয়তো অবাকই লাগছে। আর মাকে ওর যেন খুব স্বাভাবিক লাগছে না।

মেজর ডেকার মুখ আর বাবুলের এই কচি মুখ পাশাপাশি রেখে শর্মিলার কিছু মেলানোর চেষ্টা। কিন্তু কানমাথা রাবারের টুপীতে ঢাকা ওই লোকের মুখের আদল কতটুকু বা লক্ষ্য করেছে। সব মিলিয়ে যে চেহারাটা মনে এঁটে বসে আছে, তার থেকে মিলের হদিস

কিছু পেতে পারে না জানা কথাই। সব মিলিয়ে দুর্দম এক জোরালো পুরুষ শুধু দেখেছে। এখন অন্তত শর্মিলা স্বীকার করতে বাধ্য, এমন পুরুষ জীবনে দেখেনি। এই পুরুষ অনায়াসে কঠিন হতে পারে, নির্মম হতে পারে। শর্মিলার কেন এ-রকম মনে হচ্ছে জানে না। কাল ওই লোক না থাকলে শর্মিলার মৃতদেহ এক সময় বা একদিন এখানে পৌঁছুতো জানা কথা। এই পৃথিবী এই আলো-বাতাস বা এই ছেলের মুখ আর দেখতে পেত না। ওকে রক্ষা করার তাগিদেই কতবার ধমকে উঠেছে, এক হাতে দুই গাল চেপে হাঁ করিয়ে ব্র্যাণ্ডি গিলিয়েছে, কোনো দ্বিধা বা অনুমতির অপেক্ষা না রেখে নিজের দেহের সঙ্গে ওকে সাপটে আগলে নিয়ে সেই ভয়াল দুর্যোগের পথ ভেঙেছে। নিজের বিপদ নিজের মৃত্যু তুচ্ছ করে আর একজনকে রক্ষা করার জন্য এভাবে এগিয়ে আসতে পারে যে, সে অন্য ধাতুর মানুষ। এ রকম মানুষ কঠিন আর নির্মমও হতে পারে, শর্মিলার কেন যেন সেটা বদ্ধ ধারণা।

অথচ ওই লোকের ভিতরে নরম দিকও যে একটা আছে তাও অনেকবার মনে পড়েছে শর্মিলার। বমডিলা থেকে দুর্যোগে ট্রাকই ছাড়ছিল না। বুড়ো জিপ ড্রাইভারের মুখে ছেলের সঙ্কটাপন্ন অসুখের কথা শুনে তার জন্য ওষুধ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শুনে, আর ওর ছটফটানি দেখে ট্রাক ছাড়ার হুকুম দিয়েছে। ল্যাণ্ডস্লাইডে ট্রাক আটকে যেতে ওকে বেপরোয়ার মতো হেঁটে চলে যেতে দেখে নিঃশব্দে অনুসরণ করেছে। সেই করাল দুর্যোগে বারবার ওকে ভেঙে পড়তে দেখে সাহস দিয়ে বলেছে, ছেলের অসুখের কথা ভাবুন, ওষুধ নিয়ে পৌঁছুতেই হবে ভাবুন!

এ রকম পুরুষ শর্মিলা জীবনে দেখেনি, কিন্তু দেখতে কি চেয়েছিল? এই লোকের নাম মেজর দিলীপ ডেকা না হলে কৃতজ্ঞতার সীমা পরিসীমা থাকত না। কিন্তু এখন? থেকে থেকে কেবলই একটা নাড়ি-ছেঁড়া যন্ত্রণা। বাবুলকে কেড়ে নেবার জন্ত ওই

লোক যেন হাত বাড়িয়েছে।

...কিন্তু শর্মিলার সত্যি এত অস্বস্তি এত যন্ত্রণা কেন? ও না চাইলে কে বাবুলকে ছিনিয়ে যেতে পারে? সকলে জানে বাবুল তার ছেলে। ওই লোকের বা কারু এত বছর বাদে আর অন্যরকম জানার কোনো কারণ নেই। একমাত্র ফাঁস করতে পারে পার্বতী। সে কোনদিন তা করবে না। আজই বার দুই বলেছে, কণ্টাক্ট নাকচ করে বা ছুটি নিয়ে এখান থেকে চলে যাই চলুন বহীন্‌জি।

...তাহলে?

এই তাহলে নিয়েই যত সংকট আর সমস্যা শর্মিলার। বাবুল ওই দিলীপ ডেকার ছেলে এটা নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয়ে যায়নি। কিন্তু কোনভাবে যদি তা হয়, আর শর্মিলাও স্থির বুঝতে পারে বাবুল তারই ছেলে ওই বাপকে কিচ্ছু জানতে বুঝতে না দিয়ে চিরদিনের মতো বঞ্চিত করে ছেলে নিয়ে পালাবে শর্মিলা? না পালালেও কোনদিন তাকে সত্য জানতে দেবে না?

যত যন্ত্রণাই হোক এখানেই তার নিজের সঙ্গে বিরোধ যুদ্ধ।

সন্ধ্যে পর্যন্তও ডক্টর ভট্টাচার্যের দেখা নেই বলে অবাক হচ্ছিল। বিকেল পাঁচটা নাগাত জিপের বুড়ো ড্রাইভার বমডিলা থেকে গাড়ি নিয়ে ফিরেছে। কাল সমস্ত দিন আর আজও সর্বক্ষণ তাগিদের ওপর রেখে বেলা তিনটের মধ্যে জিপ রিপেয়ার করিয়েছে। শর্মিলার ক্যাম্পে থেমে তার কুশল সমাচার নিয়ে হাসপাতালে চলে গেছে। শর্মিলা সেই থেকে ভাবছে, এতক্ষণ বৃষ্টির জন্য আসতে পারেনি ভদ্রলোক, এবার ওই জিপে আসবে।

জিপটা দেখে শর্মিলার আবারও মনে হয়েছে, ওপরঅলার বিশেষ যোগসাজস ছাড়া অমন পরিস্থিতি হয় না, হতে পারে না। জিপ যাবার পথে বিগড়লে এই লোকের সঙ্গে দেখা হত না। ওই লোক তার ক'দিন আগে পাসিঘাট থেকে বমডিলা না এলে দেখা হত না। ফেরার পথে জিপ বিগড়লে দেখা হত না। শর্মিলা একদিন আগে

বা একদিন পরে ওষুধের খোঁজে বমডিলা গেলেও হয়তো দেখা হত না। ঠিক যেমন নিখুঁত প্ল্যান করা যোগাযোগে এমন ঘটতে পারে, অলক্ষ্য থেকে কেউ যেন তাই করেছে। তাই এখানেই এর শেষ হবে শর্মিলা ভাববে কি করে?

ডক্টর ভট্টাচার্যের জিপ তার ক্যাম্পের দোর গোড়ায় এসে দাঁড়াল রাত আটটারও পরে। ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছ?

শর্মিলা জবাব দিল, ভালো।

—উহুঁ, ভালো দেখছি না, মুখ খুব শুকনো। জ্বরটর হয়নি তো?

বাবুল তার বিছানায় বসে। ফস করে বলে উঠল, মা আমার জন্যই খুব ভাবছে কাকু, কেবল আমাকে দেখছে আর দেখছে। আর এক একবার গায়ে হাত বোলাচ্ছে—আমি তো ভালো আছি কাকু, তাই না?

ডক্টর ভট্টাচার্য হেসে মাথা নাড়ল। —খুব ভালো আছিস। পার্বতীকে জিজ্ঞেস করল, ওষুধ ঠিক ঘড়ি ধরে পড়ছে তো?

পার্বতী মাথা নাড়ল, পড়ছে।

এবারে যে সমাচার জানালো ডক্টর ভট্টাচার্য শর্মিলার ভিতরে নাড়াচাড়া পড়ল একপ্রস্থ। জিপটা পেয়ে ভট্টাচার্য ক্যামেং ক্যাম্পে মেজর ডেকাকে দেখতে গিয়েছিলেন। তার আগে ফোনে খবর নিয়ে জেনেছিলেন তাঁর প্রচণ্ড জ্বর আর হাড়ে হাড়ে যন্ত্রণা। গিয়ে দেখেন জ্বর একশ চার। শরীরের বহু জায়গায় এক্সরে করা হয়েছে। হাড় কোথাও ভাঙেনি কিন্তু অনেক জায়গায় চোট লেগেছে। ভট্টাচার্যকে বলেছে, মিসেস হাজারিকাকে ধরে নিয়ে যখন নেমে আসছিল তখন ভাঙা গাছের ডালের ঘায়ে দুজনেই ছিটকে পড়েছিল। তখন কপালে চোট পেয়েছে। আর পরে যখন অজ্ঞান অবস্থায় তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে পথ ভাঙতে হয়েছে তখন অনেকবার পা হড়কেছে, আর ওকে আগলাবার ধকলে বেশিরভাগ চোট নিজের ওপর দিয়ে গেছে। দু'চোখে স্নেহ উপছে পড়ছিল, ডক্টর ভট্টাচার্যের। বললে,

নিজের অত জ্বর ব্যথা বেদনার দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই লোকটার, বারবার কেবল তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল। বলছিল, চেষ্টা সত্ত্বেও অনেকবার তোমারও চোট লেগেই গেছে—কেমন আছ—এক্সরে-টেক্সরে করার দরকার হলে ওদের ওখানে অ্যারেঞ্জ করা যেতে পারে—কোথাও ব্যথা থাকলে এক্সরে করে নেওয়াই উচিত।

শর্মিলা বিড়বিড় করে জানান দিল, তার কোথাও কিছু হয়নি, গা হাত পায়ে কিছু ব্যথা আছে, নইলে ভালোই আছে।

এরপর যে প্রসঙ্গের অবতারণা, সেটা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু শুনতে শুনতে একটা অস্বস্তিকর হতাশা যেন ভেতরটাকে গ্রাস করছে ওর। প্রশংসার ছলেই বলছিল ডক্টর ভট্টাচার্য।···আর্মিতে লোকটার সুনাম খুব, মেজর থেকে শিগগীরই আবার প্রমোশন পাবে। যেমন সাহস তেমনি চরিত্র বল। দেড় বছরের ওপর ওয়ার প্রিজনার হয়ে ছিল। শত্রুর গুলিতে যে-কোনো মুহূর্তে প্রাণ যেতে পারত। কিন্তু এদিকে বড় দুঃখের জীবন মানুষটার। বউ ছিল, আট মাসের একটা ফুটফুটে ছেলে ছিল। মেঘালয়ে সেই ছেলের ঘটা করে অন্নপ্রাশন দিয়েছিল। তারপরেই জীবনের সব সাধ আহ্লাদ শেষ। এমারজেন্সি কলে বুড়ী মায়ের কাছে বউ ছেলে ফেলে দেশের আর এক প্রান্তে গিয়ে আটকা পড়ে গেল। এদিকে বউ ছেলেসুদ্ধ গৌহাটির কাছ সেই ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল—কিন্তু ও খবর পেল দু'বছর বাদে। তার আগে বুড়ী মা-ও চোখ বুজেছে। দুনিয়ায় নিজের বলতে আর কিছু থাকল না। সেই একই ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে শর্মিলার স্বামী মোহন হাজারিকা মারা গেছে শুনে সে নাকি জ্বর আর সর্বাঙ্গের ব্যথা নিয়েই লাফিয়ে বিছানায় উঠে বসেছিল। আর একটিও কথা বলেনি।

সবটাই শোনা কথা শুনল শর্মিলা। তবু মনে হল সে যেন কিছু একটা অনাগত সংকটের দিকে এগোচ্ছে।

ডক্টর ভট্টাচার্য চলে যেতে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু আজ আর চোখে ঘুম নেই। ঘুরেফিরে ওই ভয়াল দুর্যোগের ছবিগুলো চোখে ভাসছে। অজ্ঞান হবার পর লোকটা দু'মাইল পথ বয়ে নিয়ে এলো কি করে? আসুরিক শক্তি আর সাহস থাকলেই বা অমন অবস্থায় এ-সম্ভব কি করে? ভাবতে গিয়ে অন্ধকারেই মুখ লাল আর নিজের ওপর বিরক্তি। ওকে ব্রেভ লেডি বলাটা যেন ব্যঙ্গের ব্যাপার। কেন অত মাথা খারাপ হয়ে গেল, কেন জ্ঞান পর্যন্ত খুইয়ে বসল! ক্যাম্পে পৌঁছুতে রাত এগারোটা বেজেছে যখন, দশ-বিশ গজ করে এগিয়ে ওকে কোলে-পিঠে রেখেই নিশ্চয় বারবার বিশ্রাম নিতে হয়েছে। শর্মিলা লম্বায় পাঁচ ফুট পাঁচ, সেই মতো সুডোল স্বাস্থ্য, শেষ ওজন দেখেছিল ষাট কেজির ওপর। এ-রকম একটা অজ্ঞান দেহ অমন দুর্যোগে বয়ে আনল কি করে! অনেক বার পড়ে গিয়ে চোট পেয়েছে যখন ওকেসুদ্ধ নিয়েই পড়েছে নিশ্চয়, কিন্তু তার মধ্যে ও যাতে আঘাত না পায়, সেভাবে কি করে আগলালো ওকে। আঘাত তো সত্যিই বিশেষ পায়নি। আগলানোর সম্ভাব্য চিত্র ভাবতে গিয়েও কান-মাথা গরম। কি লজ্জা, কি লজ্জা, অজ্ঞান না হয়ে একেবারে মরে গেলে কি ক্ষতি হত!

পরদিনও সন্ধ্যা নাগাত ডক্টর ভট্টাচার্য এসে জানাল, মেজর ডেকার জ্বর কমেনি, আর হাড়ের ব্যথাও তেমনি। কিন্তু সে যাওয়া মাত্র নাকি, আগে বাবুলের খবর আর শর্মিলার খবর নিয়েছে। ভট্টাচার্য জিজ্ঞেস করল, তা তুমি কেমন আছ, আজ আরো ভালো তো?

—হ্যাঁ। শর্মিলা শান্ত মুখে ভেবে নিল একটু।—আপনি কালও বিকেলের দিকে দেখতে যাবেন তাকে?

—চিকিৎসা মিলিটারি ডাক্তারই করছে, তবু সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত একবার করে দেখে আসা তো উচিত। কেন?

—কাল তাহলে একটু আগে জিপটা পাঠিয়ে আমাকেও নিয়ে যাবেন।

ডক্টর ভট্টাচার্য খুশি মুখেই সায় দিল। বলল, কথাটা আজ আমিই তোমাকে বলব ভাবছিলাম।

প্রাণপণে হাল ছেড়ে ওপরঅলার ওপব নির্ভর করতে চাইছে। যা হবার হবে। যা ঘটবার ঘটবে। ও আব নিজের সঙ্গে যুঝবে না। মর্জির বিরুদ্ধে যাবে না। এতদিন কর্তব্য করে এসেছে। কর্তব্যের তাগিদেই চলেছে।

ছোট একটা আলাদা কেবিনে শুয়ে ছিল মেজর ডেকা। ভট্টাচার্যের সঙ্গে ওকে ঢুকতে দেখে একগাল হেসে শোয়া থেকে উঠে বসল। কপালে ব্যাণ্ডেজ, গায়ের কম্বল সরে যেতে দেখা গেল, বুক-জোড়া লিউকোপ্লাস্ট ব্যাণ্ডেজ। পায়েরও জায়গায়,জায়গায় তাই। শর্মিলা সেদিকে লক্ষ্য করছে দেখে তাড়াতাড়ি আবার কম্বল চাপা দিল। তারপর হাসিমুখে সামনের চেয়ার দেখিয়ে আপ্যায়ন করল, বসুন বসুন—আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল আজ আপনি আসবেন।

শর্মিলা চেষ্টা করে হাসল। প্রাণপণে সহজ হতে চাইল। ভবিষ্যতে অনেক হয়তো সইতে হবে, এখন থেকে নিজের ওপর দখল বিস্তার না করতে পারলে তার নিস্তার নেই।

বসল। ডক্টর ভট্টাচার্যও।—তারপর, আজ কেমন ভায়া ?

—অনেক ভালো। জ্বর দুইয়ের নিচে।

—ব্যথা ?

সঙ্গে সঙ্গে একমুখ হাসি।—এতক্ষণ ছিল, ম্যাডামকে দেখে একেবারে কমে গেল।

ভট্টাচার্য হা-হা করে হেসে উঠল। শর্মিলাও হাসতে চেষ্টা করল। তারপর আরো সহজ হবার জন্য উঠে বেডের গায়ে ঝোলানো চার্টটা দেখতে গেল। ওতে রোগীর সমাচার লেখা।

সেদিকে চেয়ে দিলীপ ডেকা বলে উঠল, এমনিতেই ওরা

আমাকে ধরে-বেঁধে নাজেহাল করছে ম্যাডাম—আপনি কিছু সাজেস্ট করে আর যেন ওদের উস্‌কে দেবেন না।

শর্মিলা হাসিমুখেই চেয়ারে ফিরে এলো আবার। বলল, আপনাকে নাজেহাল করার ক্ষমতাও কেউ রাখে তাহলে?

সবল পুরুষেরই হাসি। ডক্টর ভট্টাচার্যের দিকে চেয়ে বলল, বুঝলে দাদা, উনি এক ভয়ংকর ডাকাতের হাতে পড়েছেন ভাবছিলেন, আর আমি ভাবছিলাম এখন পর্যন্ত ঈশ্বর আমাকে জীবনে এই একটাই দিন দিয়েছেন।

শর্মিলা ভিতরে ভিতরে সচকিত। এ-কথার অনেক রকম অর্থ হতে পারে। দিলীপ ডেকা সোজা মুখের দিকে তাকালেন, আপনি জবরদস্ত ডাকাত ভেবেছিলেন কিনা?

শর্মিলা মৃদু হেসে ফিরে জিজ্ঞেস করল, আপনি সেটা বুঝেও নিজের পরিচয় দিলেন না কেন?

—বিকজ, ইউ আর এ ভেরি ব্রেভ লেডি। আপনার সাহস দেখে আমার ভালো লাগছিল। তার ওপর গোড়া থেকেই আমাকে কেমন সন্দেহজনক লোক ভাবছেন মনে হতে মজা পেয়ে গেলাম। ..তারপর যে বিভ্রাটে পড়া গেল, আর কিছু ভাবার বা বলার সময় ছিল? হাসছেন, এখান থেকে যাবার আগেই দাদার মুখে শুনেছিলাম একজন স্মার্ট ইয়ং লেডি আমাদের মধ্যে আসছেন অ্যাজ্‌ মেডিক্যাল অফিসার—তখন থেকে আপনাকে দেখার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ওপরঅলা এমন দেখাই দেখিয়ে দিল—বাপরে বাপ।

মানুষটার গলার স্বর ভারী, কিন্তু স্বচ্ছ। মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, একটু কফি খাবেন? বলি আনতে?

যেভাবে বলল শর্মিলা আপত্তি করতে পারল না। দিলীপ ডেকা একজন পুরুষ নার্সকে ডেকে কফির অর্ডার দিল। তারপর ভট্টাচার্যের উপস্থিতি ভুলেই যেভাবে মুখের দিকে চেয়ে রইল, শর্মিলার কেন যেন অস্বস্তি। সহজ হবার জন্য বলল, আপনার

জন্যেই প্রাণ বেঁচে গেছে, কিন্তু কৃতজ্ঞতার কথা আর কি বলব…।

এখন আর হাসছে না। ডক্টর ভট্টচার্য বলছিল, খুব মুডি লোক…। দু'চোখ মুখের ওপর আটকে আছে, কিন্তু আসলে লোকটা যেন অন্য কোনো ভাবনার মধ্যে তলিয়ে গেছে।

ডক্টর ভট্টাচার্য অবাক একটু। শর্মিলা কি বলছে শুনলে।

অপ্রস্তুত একটু।—না অন্য কথা ভাবছিলাম। তিন বছর আগের একটা ব্যাপার মনে পড়তে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। যাক, কি বলছিলেন?

ওর দিকে চেয়ে এভাবে অন্যমনস্ক হবার মতো কি হল শর্মিলা ভেবে পেল না। ডক্টর ভট্টাচার্য বলল, তুমি ওকে প্রাণে বাঁচিয়েছ, কিন্তু কৃতজ্ঞতার কথা কি আর বলবে—এই কথা।

দিলীপ ডেকা মাথা নাড়ল। গম্ভীর।—কিছুই বলবেন না, ও-সব শুনতে আমার ভালো লাগে না। আই অ্যাম এ টাফ ম্যান অ্যাণ্ড আই লাইক টাফ জব—যা করেছি, শক্তি থাকলে সকলেই করত। দরজার দিকে তাকিয়েই গমগমে গলায় ধমকে উঠলেন, হোয়ার ইজ কফি?

দরজার কাছে থেকে সেই ছেলেটা ছুটল আবার। এক মিনিটের মধ্যে নিজেই কফি নিয়ে হাজির।

শর্মিলা তিনটে পেয়ালাতে কফি ঢেলে একটা ভট্টাচার্যের দিকে আর একটা মেজর ডেকার দিকে এগিয়ে দিল। মানুষটার তিনটে আঙুল চুরুটের তাতে আর ধোঁয়ায় লাল বর্ণ।

—থ্যাংক ইউ। বাই দি বাই আপনার ছেলে কেমন?

—এখন ভালো। ওই ওষুধটা পড়তে অনেক উপকার হয়েছে।

কফি খেতে খেতে আবার যেন কিছু ভাবনার মধ্যে তলিয়ে গেল মানুষটা। অথচ পেয়ালার ওপর দিয়ে দু'চোখ শর্মিলার দিকে। তারপর হঠাৎই হাসল একটু, সেদিন রাস্তায় অমন মারাত্মক দুর্বি-পাকের সময়েও কিন্তু জানা ছিল না, আপনার সঙ্গে আমার এমন

অদৃষ্টের যোগ। দাদা আগে বলেন নি · সেই একই ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে আমারও স্ত্রী আর আট মাসের ছেলে চলে গেছে, শুনেছেন বোধহয় ?

শর্মিলা অস্ফুট জবাব দিল, ডক্টর ভট্টাচার্য বলেছেন।

আবার একটু লক্ষ্য করে ডেকা বলল, আপনার এ-প্রসঙ্গ ভালো লাগছে না দেখছি, আই অ্যাম সরি। হাসল একটু, অ্যাই অ্যাম সর্ট অফ এ ডেভিল হু ক্যান টেক এভরিথিং।

আর দু'পাঁচ মিনিট বসে কাজের অছিলায় শর্মিলা উঠে পড়ল। ছেলের ব্যাপারটা ছাড়াও কোথায় যেন অস্বস্তি। সামনে বসলে মনে হয় লোকটার মধ্যে পৌরুষ বড় বেশি প্রবল। সেই দুর্যোগে অজ্ঞান অবস্থায় এই শরীরটা কতবার কতভাবে এই লোকের নিবিড় দখলের মধ্যে থেকেছে মনে হতে গা শির শির করে উঠেছে।

ক'দিন অবিরাম বৃষ্টির পরে আকাশ এখন কিছুটা পরিষ্কার। ফলে রোগীর সংখ্যা বেশি। শর্মিলা তাই চায়। কাজের মধ্যে ডুবে যেতে চায়। এমন কি বাবুলের সঙ্গেও কথাবার্তা বেশি বলে না। ভিতরে একটা প্রতীক্ষা থিতিয়ে আছে। কিছু ঘটবে। কি ঘটে, কবে ঘটে, কেমন করে ঘটে সেই প্রতীক্ষা যেন।

রোগীদের আনন্দ, তারা যেন তাদের মেম ডাক্তারকে নতুন করে ফিরে পেয়েছে আবার। কত বড় দুর্বিপাকে পড়েছিল, আর কিভাবে কেমন করে বেঁচে ফিরেছে সে খবর তারা রাখে। অজ্ঞান অবস্থায় কে তাকে নিজের জীবন বিপন্ন করে ঘরে এনে পৌঁছে দিয়েছে তাও জানে। মেজরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ তারা। একটা বছর থেকে ওই লোক নাকি তাদের গাঁয়ের অনেক উন্নতি করে দিয়ে গেছে। যেমন কড়া তেমনি রাগী মানুষ। কিন্তু দিল্ আছে। ওই লোক আবার ফিরে এসেছে শুনে তারা খুশি।

এত খবর এরা কি করে জানল, অনুমান করতে পারে। দুর্যোগের

দিনে বিকেল থেকে পার্বতী আর ডক্টর ভট্টাচার্যের সঙ্গে উদগ্রীব হয়ে কম্পাউণ্ডার হানুডিকও ক্যাম্পে অপেক্ষা করছিল। রাত এগারোটায় ওই অবস্থায় ওকে নিয়ে মেজরকে ঘরে ঢুকতে দেখেছে। তার পরেও প্রায় ঘণ্টাখানেক থেকে মেজরকে অনেকটা পথ কামেং-এর দিকে এগিয়ে দিয়ে সে ঘরে ফিরেছে। ফলে এমন এক বীরত্বের খবর শুধু তার গাঁয়ে কেন, বোধহয় অন্য গাঁয়েও ছড়িয়েছে।

বিকেলের দিকে সামনের গাঁয়ে পায়ে হেঁটেই রোগী দেখতে গেছল। সেখানেও অনেকের মুখে ঈশ্বরের দয়া আর মেজরের প্রশংসার কথা শুনতে হয়েছে। বিশেষ করে জ্বরে শয্যাশায়ী এক মাঝবয়সী রোগিণীকে দেখতে গেছল। কিন্তু তাকে দেখার আগে সে ওকে দেখল, সস্নেহে গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিল। তারপর একই মুখে ওপরঅলার আর মেজরের সুখ্যাতি। অন্য ফৌজী লোকদের থেকেও ওই মেজর ঢের বেশি মদ খায় শুনেছে, কিন্তু কক্ষনো অন্য জোয়ানদের মতো অসভ্যতা করে না। ফিস-ফিস করে বলেছে, মদ ভেট দিয়ে ওদের ফুর্তির মেয়ে যোগাড় করাটা তো ওই লোকের দাপটেই অনেক কমে গেছে। হাতে-নাতে ধরতে পারলে কঠিন সাজা দিত।

ক্যাম্পে ফেরার পথে কেন যে মেজাজ প্রসন্ন নয় শর্মিলার, জানে না। ওই লোকের অত সুখ্যাতি শুনলে ও আরো বেশি দুর্বল হয়ে যায় কেন? বরং সাধারণ লোকের থেকে ঢের বেশি মদ গেলে শুনে একটু খুশি হয়েছিল। মদ খাওয়া ও দু'চক্ষে দেখতে পারে না। অত মদ গিলে স্নায়ু ঠিক রাখাটাও তার চোখে বড় কিছু নয়। বউ ছেলে খুইয়েছে, যুদ্ধবন্দী অবস্থায় বন্দুকের নলের মুখে দেড় বছর কাটিয়েছে, স্নায়ুগুলো ইস্পাত হবে না তো কি। সেই জোরের নজির ওর থেকে আর কে বেশি অনুভব করতে পারে? গাল টিপে ধরে ওকে পর্যন্ত বোতল থেকে ব্র্যাণ্ডি গিলিয়ে ছেড়েছে। সেই বোতলের মুখ ওর ঠোঁট ছেড়ে জিভেও ঠেকেছে—আবার সেই

বোতলই নিজের মুখে উপুড় করেছে।

রাগের মুখে ধৃষ্টতা ভাবছে। অথচ এও জানে ধৃষ্টতার কিছু ছিল না। আসল কথা ওই লোক সামনে এলে বা তার প্রসঙ্গ শুনলে একটা অজানা স্পর্শ আষ্টেপৃষ্ঠে যেন ছেঁকে ধরে তাকে। সেটাই বাতিল করার চেষ্টা।

ক্যাম্পের দরজায় পা দিয়েই দাঁড়িয়ে গেল। ঘরের মধ্যে হুটোপুটি আর হুল্লোড় চলেছে। শর্মিলা দাওয়ায় উঠে আস্তে আস্তে দরজার সামনে দাঁড়াল। দিলীপ ডেকা খেলনার মতো বাবুলকে ধরে মাথায় তুলছে, এ-হাত থেকে ও-হাতে নিচ্ছে, পিঠে নামাচ্ছে, ওর ছোট্ট শরীরটা উল্টেপাল্টে যা খুশি তাই করছে। আর বাবুল মজা পেয়ে চেঁচাচ্ছে আর হাসছে খিলখিল করে।

এদিকে ফিরতে চোখাচোখি। হাসি মুখে পিঠ থেকে বাবুলকে নামিয়ে দিলীপ ডেকা রুমালে মুখ মুছল। বলল, আপনার ছেলে আমার গায়ের জোর না দেখে ছাড়বে না। আপনার কম্পাউণ্ডার হান্ডিকের মুখে ও নাকি শুনেছে, আমার গায়ে এত জোর যে অজ্ঞান অবস্থায় ঝড় জলের মধ্যে ছু'মাইল পথ আপনাকে আমি আলতো করে তুলে এনেছি। তাই জোর দেখাতে হল—

হান্ডিকের সঙ্গে বাবুলের খুব ভাব। কিন্তু এই প্রথম বেচারা কম্পাউণ্ডারের ওপর রেগে গেল শর্মিলা। রাগ হলেও সেটা প্রকাশ না করার মতো ভব্যতা জ্ঞান শর্মিলার আছে। কিন্তু কি হল কে জানে, হঠাৎ যেন সেটুকুও খুইয়ে বসল। গম্ভীর ঠাণ্ডা মুখেই বলে ফেলল, দেখিয়ে ভালো করেন নি, ওর শরীর এখনো খুব দুর্বল।

সঙ্গে সঙ্গে দিলীপ ডেকা ভয়ানক অপ্রস্তুত।—আই অ্যাম সো সরি, খুব অন্যায় হয়েছে, আমার সত্যি খেয়াল ছিল না।

কিন্তু গোল পাকালো বাবুল। সে বলে উঠল, কেন মা, আমি তো ভালো আছি। তুমিই তো বললে, কাল থেকে স্কুলে যেতে হবে।

সরোষে শর্মিলা তার দিকে তাকালো এবার।—খুব দুষ্টু হয়েছ — যাও, আন্টির কাছে চলে যাও।

ছেলেরও মেজাজ আছে, মা খামোখা বকছে বুঝিয়ে দেবার জন্য দুপ-দাপ পা ফেলে অন্য ঘরে চলে গেল।

দিলীপ ডেকা একটু অবাক চোখে শর্মিলার দিকে চেয়ে আছে। ঠিক এ-রকম অভ্যর্থনা প্রত্যাশিত ছিল না।

ভিতরে ভিতরে অপ্রস্তুত এখন শর্মিলাও। সামলে নেবার মতো করে বলল, আপনার কি দোষ, ছেলেটা এমন বাঁদরামো করে—বসুন।

বসার জায়গা বাইরের ঢাকা বারান্দায়। কিন্তু এই হুটোপুটি চলছিল ওর শোবার ঘরে। কিন্তু নিজের আচরণ শোধরাবার জন্যেই আর বাইরে না ডেকে ঘরেই বসতে বলল।

দিলীপ ডেকা বেতের চেয়ারটা টেনে বসল। শর্মিলা নিজের শয্যায়। সহজ হবার চেষ্টা, জিজ্ঞেস করল, এখন সম্পূর্ণ সেরে উঠেছেন তাহলে?

—মোটামুটি···বুড়ো হাড়ের ব্যথা চট করে যাবার নয়।

শর্মিলা বলল, তাহলে আপনার পক্ষেও তো ও-রকম ছুটোছুটি করা ঠিক হয় নি।

ভদ্রলোক মুখের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল। তারপর বলল, আচ্ছা ম্যাডাম, ও-রকম বে-ফাঁস রাগ করে ফেলাটা আপনার স্বভাব নয় অথচ করে ফেলেছেন—তাই না?

শর্মিলা ভিতরে ভিতরে নাড়াচাড়া খেল একপ্রস্থ। -কেন?

—দরজায় আপনাকে দেখামাত্র আমার কেমন মনে হয়েছে, আমি আসায় ওই আন্টি না কে—যার কাছে ছেলেকে পাঠালেন—তার মতোই আপনিও অখুশি হয়েছেন।

হাসছে অল্প অল্প। তার মুখের ওপর শর্মিলার দু'চোখ থমকালো আবার।—ওর নাম পার্বতী, ছেলে ওর হাতেই বড় হয়েছে··সে কি করেছে?

—আমি আসার সঙ্গে সঙ্গে আপনি পেশেন্ট দেখতে গেছেন বলে আমাকে বিদায় করতে চেয়েছে। আপনি কতক্ষণে ফিরবেন জিজ্ঞেস করতে বলেছে, ঠিক নেই, রাতও হতে পারে। আপনার ছেলে তখন বলে ফেলেছে, আপনি বিকেলের মধ্যেই ফিরবেন জানিয়ে গেছেন—তাই শুনে সেও আপনার মতোই ওর উপর রাগ করেছে। শেষে ছেলেটার আমার কাছে আসার ইচ্ছে অথচ সে আসতে দিতে চায় না দেখে যখন বলেছি, আমি মিলিটারির লোক, মেজাজপত্র সব সময় ভালো থাকে না, ছেলেকে এখানে রেখে তার পক্ষে ঘরে চলে যাওয়াই ভালো— তখন রাগ করে ভিতরে চলে গেছে।

রাগ আবার কেন যেন শর্মিলারও হচ্ছে। তবু ধামাচাপা দেবার মতো করেই বলল, ওকে খুব ভালোবাসে, শরীর খারাপ, তাই চোখের আড়াল করতে চায় না। হেসেই ঠেস দিল, কিন্তু আপনি তা বলে ওকে মিলিটারির দাপট দেখালেন?

হেসে উঠল। স্বভাবের দোষ। এই অরুণাচল দেশটাই মিলিটারির দাপটে চলছে। পেশেন্ট কোথায় দেখতে গেছলেন, জং বস্তিতে?

সেটাই সব থেকে কাছের গ্রাম। শর্মিলা মাথা নাড়ল—তাই।

—ওদের অনেকে আট-ন'মাইল রাস্তা ঠেঙিয়ে আমাকেও দেখতে গেছল! বড় ভালো মানুষগুলো, আপনারও খুব প্রশংসা করেছে সকলে—

প্রসঙ্গান্তরের ফলে শর্মিলা স্বস্তি বোধ করছে। হেসেই বলল, আর আজ রোগী দেখতে গিয়ে আপনার প্রশংসা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা—

দিলীপ ডেকা মজা পেয়ে জবাব দিল, তাহলে তফাৎটা বুঝুন, আপনার প্রশংসা শুনে আমার কান জুড়িয়েছে আর আমার প্রশংসা শুনে আপনার কান ঝালাপালা হয়েছে।

বলতে বলতে পকেট থেকে চামড়ার সিগার কেস বার করে সেই মার্কামারা একটা সরু চুরুট টেনে নিল। হাসি মুখেই শর্মিলা আবার এক ঘা বসালো। বলল, আপনার মিলিটারি মেজাজ আবার না বিগড়য়, ঘরে ওই জিনিসটি না খেলে আপনার খুব অসুবিধে হবে?

অপ্রতিভ মুখে দিলীপ ডেকা ঠোঁট থেকে চুরুট নামিয়ে আবাব কেস-এ পুরে বলল, আই অ্যাম রিয়েলি সরি, আমার আগে জিজ্ঞেস করে নেওয়া উচিত ছিল।

শর্মিলার গলার স্বর এবারে আরো একটু সহজ।—তা না, আপনার অভ্যেস যখন কষ্ট হবেই, এক কাপ স্ট্রং কফি খান, ভালো লাগবে—

—খুব ভালো প্রস্তাব, আনতে বলুন।·· আমি এসেছি প্রায় ঘন্টাখানেক হয়ে গেল, কফির আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম।

খোঁচার আঁচড় পড়লেও শর্মিলা গায়ে মাখল না। জবাব দিল, এটা নিশ্চয় পার্বতীর অন্যায় হয়েছে। পাঁচ মিনিটে পেয়ে যাবেন—

উঠে কফির কথা বলে তক্ষুণি ফিরে এলো। দিলীপ ডেকার দু'চোখ তখন ঘরে টাঙ্গানো মোহন হাজারিকার ছবির দিকে। ওদিকে আণ্টি কফি বানাতে যাবার ফলে বাবুল আবার এ-ঘরে হাজির। এই নতুন মানুষ অর্থাৎ আংকল ডেকাকে তার বেশ মজার লোক মনে হয়েছে। দিলীপ ডেকা হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে নিল। তারপর ওর দিকে একবার ভালো করে তাকিয়ে আবার ছবিটার দিকে তাকালো। ছবি থেকে দৃষ্টিটা শর্মিলার দিকে ফিরল। হালকা সুরেই মন্তব্য করল, ছেলে কিন্তু বাবা মা কারো মুখেরই আদল পায়নি—

বাবুল আবার ঘরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তি শর্মিলার। ফোটো ছেলে আর ওকে পর পর দেখাটা আরো অস্বস্তিকর ঠেকেছে। কিন্তু মন্তব্য শোনার সঙ্গে সঙ্গে অবুঝের মতোই ভেতরটা তেতে

উঠল। বক্র স্বরে বলে উঠল, সেটা কি খুব অবাক হবার মতো কিছু?

—তা না। মুহূর্তের মধ্যে মানুষটা যেন কোনো দূরের স্মৃতির মধ্যে তলিয়ে গেল। তারপর বলল, আমার আট মাসের ছেলেকে দেখলেই সকলে বলত, একেবারে মায়ের মুখখানা বসানো।

শর্মিলার ভেতর সজাগ, চাউনি তীক্ষ্ণ। কিন্তু না, ভদ্রলোক নিজের কিছু চিন্তার মধ্যেই তলিয়ে গেছে, ছেলেকে দেখছে না। ছেলের মুখের দিকে চেয়ে কারো আদল খুঁজছে না।

কফির ট্রে হাতে পার্বতী ঘরে ঢুকল। পেয়ালায় কফি ঢেলেই এনেছে। একটা পেয়ালা তুলে নিয়ে শর্মিলা বাবুলকে ডাকল, এদিকে আয়—

দিলীপ ডেকা এক হাতে কফির পেয়ালা নিল, ছেলেকে অন্য হাতে কোলের কাছে তেমনি জড়িয়ে ধরে থেকে বলল, থাক না, কিছু অসুবিধে হবে না—

বাবুলও তাই চায়। সোৎসাহে তার দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের ক্যাম্পে ইয়া ইয়া কয়েকটা ঘোড়া আছে দেখেছি—আমাকে চড়াবে?

—নিশ্চয় চড়াবো। তারও তেমনিই উৎসাহ।

—কবে?

—যেদিন খুশি, মায়ের সঙ্গে জিপে করে চলে যেও, নয়তো আমিই জিপ নিয়ে আসব'খন। আমার সঙ্গে যাবে, ঘোড়ায় চড়বে।

উৎফুল্ল মুখে বাবুল মায়ের দিকে ফিরল। কিন্তু মায়ের মুখখানা সদয় মনে হল না একটুও। বিরস মুখে আবার এদিকে।—মা চড়তে দেবে না—রাগ করবে।

ফলে বাবুলের ওপর আরো রেগে গেল শর্মিলা। কারণ একথা শুনেই ভদ্রলোকের কৌতুকমাখা দু'চোখ তার মুখের ওপর। জিজ্ঞেস করল, ঘোড়ায় চড়বে শুনে সত্যি ঘাবড়ে গেলেন নাকি?

শর্মিলার কেন যে এই মাখামাখি পছন্দ নয়, সেটা এক পার্বতী ছাড়া আর কে জানে? গম্ভীর মুখেই জবাব দিল, এই বর্ষায় ঘোড়ায় যিনি চড়াবেন আর যে চড়বে, দুজনারই উৎসাহ একটু কম থাকা ভালো।

শুনে যেন আরো মজা পেল দিলীপ ডেকা। মুখে কপট গাম্ভীর্য।—হ্যাঁ, বর্ষা আর বর্ষার পাহাড়ী রাস্তা আপনার বোধহয় অনেক কাল মনে থাকবে—আমার তো থাকবেই।

থমথমে মুখে পার্বতী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সে আশা করেছিল, বউনজি তাকে ছেলেকে নিয়ে যেতে বলবে।

শর্মিলা সোজাই তাকালো তার দিকে। যা বলতে চায়, না বোঝার কথা নয়। সেই দুর্যোগের দিন সম্পর্কে কামেং ক্যাম্পেও হেসে হেসে বলেছিল, ঈশ্বর এখন পর্যন্ত তাকে ওই একটাই দিন দিয়েছে।

ঘোড়া চড়া ভেস্তে গেল ধরে নিয়ে বাবুল আবার আব্দার ধরল, তাহলে আমাকে একদিন জঙ্গল দেখাতে নিয়ে চলো।

—সব হবে। দিলীপ ডেকার এতেও উৎসাহ, আদর করে ওকে তুলে এক হাঁটুর ওপর বসালো।—কি শিকার করার ইচ্ছে? ভালুক না হাতি?

আমার বন্দুক নেই, কি দিয়ে শিকার করব?

—নেই? তাহলে এসে যাবে। এবারে বমডিলা গেলেই তোমার জন্য একটা ছোট্ট বন্দুক চলে আসবে। কিন্তু তোমার মা যদি ওই বন্দুক দিয়ে ডাকাত মারতে বলেন?

—ডাকাত কোথায়? বাবুল অবাক।

আরো গম্ভীর মুখে দিলীপ ডেকা নিজের বুকে আঙুল ঠেকালো। —এই তো।

—ধেৎ। বাবুল হেসে উঠল।

এই সহজ আর সরল রসিকতা শর্মিলারও খারাপ লাগার কথা

নয়। কিন্তু শর্মিলা উল্টে তেতেই উঠছে ভিতরে ভিতরে। ওই অঘটনের ফলে এই হৃদ্যতার ওপর যেন তার একটা অধিকার বর্তেছে।······খানিক আগে বলেছিল ছেলের মুখের সঙ্গে বাপ-মায়ের মুখের মিল নেই, আর বলেছিল, তার ছেলের মুখ দেখে লোকে বলত, একবারে মায়ের মুখখানা বসানো। সেই থেকে শর্মিলা এই লোকের ওপর তীক্ষ্ণ চোখ রেখেছে। না, এই ছেলের মুখে সেই আদল খোঁজার কোনো লক্ষণ দেখেনি। হয়তো সেটা মনেই আসেনি। তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে এখন পর্যন্ত বাবুলের সঙ্গে এই হৃদ্যতার লক্ষ্য শর্মিলা নিজে। আর সেখানেই শর্মিলার ব্যক্তিত্ব সজাগ। বিরূপও।

ঘরের মধ্যে দিনের আলোয় টান ধরেছে। উঠে আলোটা জ্বেলে দিল। একই সঙ্গে বাইরে জিপের হর্ণ। দিলীপ ডেকা মুখ কোঁচকালো।—এঃ, হতভাগা ঠিক ঘড়ির কাঁটা ধরে এসে হাজির হয়েছে।

শর্মিলা বাইরের দিকে চেয়ে দেখল, মিলিটারি জিপ একটা।

বাবুলকে কোল থেকে নামিয়ে উঠে দাঁড়াল। শর্মিলাকে বলল, আমার ক্যাম্পের বন্ধুদের ধারণা এখনো ভালো মতো সেরে উঠিনি —ঠাণ্ডা লাগলেই আবার জ্বরে পড়ব। আপনি কি বলেন?

চোখে চোখ রেখে শর্মিলা জবাব দিল, যাঁরা চিকিৎসা করছেন তাঁরাই ভালো বলতে পারবেন -তবে ঠাণ্ডা লাগানো কোনো অবস্থায় ভালো নয়।

—তাহলে চলি?

—আসুন। দু'হাত বুকের কাছে জুড়ে ঠাণ্ডা সৌজন্য দেখালো শর্মিলা।

পা না বাড়িয়ে দিলীপ ডেকা আর একটু দেখে নিল।—আবার কবে দেখা হবে?

শর্মিলার মুখে জবাব এসে গেছল, দেখা আবার না হলেই বা

কি? বলা গেল না। বলা যায় না। ঠোঁটের ফাঁকে জোর করেই হাসির আভাস ফোটালো একটু।—আরো সুস্থ হলে আসবেন একদিন।

মানুষটা হঠাৎ গম্ভীর এবার।—আমি নিজেকে সুস্থ ভাবলেই সুস্থ। শিগগীরই আবার আসব, কারণ আপনাদের কাছে আমি এত অবাঞ্ছিত কেন সেটা এখন পর্যন্ত ভালো করে আমার মাথায় ঢোকেনি। আচ্ছা, গুড নাইট।

চলে গেল। শর্মিলা সেখানেই স্থির দাঁড়িয়ে। বাবুল ছুটে বাইরে চলে গেছে। ছোট একটা হাত তুলে নাড়ছে, অর্থাৎ টা-টা করছে। কিন্তু লোকটা সোজা জিপে উঠে ড্রাইভারের পাশে বসেছে, আর পিছন ফিরে তাকায়নি।

বাবুল ফিরে এসে বলল, মা-ম্মি, আংকল ডেকা ভেরি ভেরি গুড।

রাগে ওকে ধরেই শর্মিলার ঝাঁকুনি দিতে ইচ্ছে করল একটা। কিন্তু ত্যাদড় ছেলের সেটা মনে থাকলে ওই লোককেই বলে দেবে মা এই করেছে বা এই বলেছে।

শর্মিলা এবারে কি করবে? পার্বতী যেটুকু পারে সে-তো তাও পারে না। দিলীপ ডেকা এসেই বাবুলের উদ্দেশ্যে একটা হাঁক দেয়। বাবুলও তক্ষুণি ছুটে বেরুবেই। তার জিপে ঘুরবে, তার সঙ্গে জঙ্গলে যাবে। শর্মিলা ঘরে থাকলে তাকে রুখতে পারে না। ওর

হাত ধরে দিলীপ ডেকা বলে, ওকে নিয়ে একটু ঘুরে আসছি ম্যাডাম, দুশ্চিন্তা করবেন না।

ঘরে না থাকলে বাবুলের যাওয়া হয় না। স্পষ্ট বলে দেয়, বহীনজি ওকে বেরুতে মানা করে গেছে, আপনি দয়া করে আমাকে মুশকিলে ফেলবেন না। অথবা বলে, বহীনজি ওকে নিয়ে ওমুক সময় ওমুক জায়গায় নিয়ে যেতে বলেছে—আমি মালিকের হুকুমে চলি।

সব থেকে অবাক কাণ্ড, ওই লোকের সঙ্গে বেরুতে না দিলে সাত বছরের ছেলে রুখে ওঠে, ফুঁসে ওঠে। রাগে চিৎকার করতে থাকে। এই অবাধ্যতার জন্য শর্মিলা এক আধ সময় শাস্তিও দিয়েছে। কিন্তু পরে দেখা হলেই ছেলে আংকল ডেকার কাছে মায়ের নামে নালিশ করেছে। তার ফলে দিলীপ ডেকারও চড়া মেজাজ। সোজা কৈফিয়ৎ তলব করে, আমাকে আপনার ভয় কেন? অবিশ্বাস কেন? এখানে ওর সঙ্গী-সাথী কেউ নেই, আমাকে ভালো লাগে, আমারও ওকে ভালো লাগে—এখানে যখন এমন এক লাইভলি ছেলে নিয়ে চলেই এসেছেন, ওকে ওর মনের খোরাক দিতে হবে। আপনার তাতে আপত্তি কেন, আমাকে এত অপছন্দই বা কেন আপনার?

ছেলেকে হাতের মুঠোয় পাবার কিছু কারণ তো আছেই। এই দু-তিন মাসের মধ্যে ওর জন্য বমডিলা থেকে মস্ত এয়ারগান এসেছে, পিঠে চাপার মতো ব্যাটারি ফিট-করা ঘোড়া এসেছে, বৃষ্টির দিনে ঘরে বসে খেলার মতো অনেক রকমের মজাদার খেলনা এসেছে। একটা ছোট্ট ক্যামেরা পর্যন্ত এসেছে। এ-সব জিনিসের দাম সামান্য নয় শর্মিলা জানে। শর্মিলা নিষেধ করে। ফলে ওই লোক যেন জেদ করে আরো বেশি জিনিস আনে। তার ওপর তার সঙ্গে বেড়ানো বা হুটোপুটি করার আকর্ষণ তো আছেই।

···তবু, কল্পনা কিনা বলতে পারে না, থেকে থেকে শর্মিলার মনে

হয়, এই বাচ্চা ছেলেরও কোথায় যেন চরিত্রগত মিল আছে ওই লোকের সঙ্গে। বড় হলে এই ছেলেও বুঝি এই রকমই গোঁয়ার, এই রকমই কঠিন বেপরোয়া স্নায়ুর মানুষ হয়ে উঠতে পারে। আর এ-রকম মনে হলেই পায়ের তলার মাটি সরতে থাকে। এখনও সন্দেহের অবকাশ আছে। সেই সন্দেহ আঁকড়ে ধরে বসে আছে। আর ভবিতব্যের ওপর সব ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। কিন্তু ওই লোক জানুক, সন্দেহের সম্বলটুকুও যদি ঘুচে যায়—তখন শর্মিলা কি করবে? এখানকার এক বছরের কন্ট্রাক্ট শেষ হলে ছেলে নিয়ে পালাবে?

শর্মিলা জানে তা সে পারবে না।

যে দিনটা কাটল সেই দিনটার মতোই যেন বাবুল তার। পরের দিন কি হবে জানে না। এত বড় এক অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে বলেই কি এই মানুষ সম্পর্কে ভিতরে ভিতরে এত আক্রোশ তার? নইলে চির জীবনের মতো যে লোকের কাছে কৃতজ্ঞ থাকার কথা, উল্টে তার প্রতি ভিতরটা এত বিরূপ এত কঠিন কেন? এই লোক যে শুধু বাবুলের আকর্ষণেই এত ঘন ঘন এসে হাজির হয়, সেটা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। বাবুলকে দখল করে ওর দিকেই এগনোর মতলব তলায় তলায়, তাও অনেক সময় বোঝা যায়। গৌহাটি থাকতে দূরের মানুষের স্তুতি অনেক দেখেছে, অনেক অনুভব করেছে। কিন্তু তার ব্যক্তিত্বের গণ্ডী টপকে আসার মতো হিম্মতের মানুষ বড় দেখেনি। এখানেও সেই ব্যক্তিত্ব নিয়েই বসে আছে। কিন্তু এই লোকের কাছে সেটাই যেন আরো বড় আকর্ষণ।

ইদানীং আবার স্কুল ফেরত ছেলেকে নিজের জিপে চাপিয়ে নিয়ে আসে। ছুটির সময় স্কুলে চলে যায়। তারপর দুজনে হল্লা করতে করতে ঘরে ফেরে। দু-তিন দিন দেখে শর্মিলা না বলে পারে নি, আপনার এত কষ্ট করে স্কুলে গিয়ে ওকে নিয়ে আসার দরকার কি? ডক্টর ভট্টাচার্য তো ব্যবস্থা করেছেন।

বলার মধ্যে বিরক্তি কতটা গোপন ছিল বলা যায় না। শুনে দিলীপ ডেকা সোজা তার মুখের দিকে চেয়েছিল খানিক। তারপর বলেছিল, আপনি আমার ছলটা ঠিক ধরে ফেলেছেন। এ-সময় ওকে নিয়ে এলে আপনার দেখা মেলে। আর আমার সময় ধরে এলে, আমি আসতে পারি ভেবেই আপনি এদিক সেদিকে পালিয়ে যান। এমনকি বেশি বৃষ্টির মধ্যেও ঘরে আপনার দেখা মেলে না।

শর্মিলা স্তব্ধ খানিক। চোখের দিকে চেয়ে এই ধৃষ্টতার কিছু জবাব দেবে। কিন্তু তার আগেই বারান্দাব একটা চেয়ার টেনে বসল। বলল, আপনি রাগ করবেন না, মিথ্যে কথা সহজে আমার মুখে আসে না। সময় না কাটলে অনেক সময় আমি জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই—ভালো লাগে। আবার কখনো ক্যাম্পে বসে চুপচাপ জানলা দিয়ে পাহাড় দেখি, আকাশ দেখি, বৃষ্টি দেখি—তাও ভালো লাগে। সেই রকমই আপনাকে দেখে আমার যদি একটু ভালো লাগে, আমাকে বঞ্চিত করবেন কেন? ভালো লাগার এই যোগা-যোগ তো ওপরঅলাই ঘটিয়েছেন—আমার কি দোষ?

একটু থেমে আবার যা বলেছে, এমন কথাও কোনো পুরুষের মুখে শোনে নি। বলেছে, আমি রসিকের মতো দেখি, কাঙাল চোরের মতো নয়। তা বলে ভাববেন না, নিছক রূপের জালে পড়ে গেছি—আমার স্ত্রী দেখতে হয়তো আপনার থেকে সুন্দরীই ছিলেন—কিন্তু আপনার মধ্যে এমন আরো কিছু আছে যা শুধু রূপ নয়, শুধু স্বাস্থ্য নয়, আরো কিছু। সেটা ঠিক যে কি আমি ধরতে পারি না—সেটা বোঝার লোভে আবার ছুটে ছুটে না এসেও পারি না।

শর্মিলা চেয়েছিল। কঠিন মুখ করেই লোকটাকে সমঝে দেবার মতো কিছু বলতে চেয়েছিল। কিন্তু ভিতরে সেই জোরটা কেন পাচ্ছে না জানে না। তবু ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, আপনি এ-সব কি বলছেন? কেন বলছেন? ভালো লাগলে ঘরে বসে আপনি পাহাড় দেখুন, আকাশ দেখুন, বৃষ্টি দেখুন, বা নিজের সুন্দরী

স্ত্রীর ফোটো দেখুন– সেটা কেউ অশোভন বলবে না।

মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। বলল, অশোভন কোনো কাজ ইচ্ছে থাকলেও করে উঠতে পারি না—এই জন্যেই নিজেকে নিয়ে মুশকিল আমার। এক একটা নজির দেখাতে পারি কিন্তু শুনলে আপনি আমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়াবেন। চলি—

শর্মিলা চলে যেতে দেখল তাকে। তিন মাস আগে সেই পাহাড়ের দুর্যোগের ইঙ্গিত কিছু হবে। নজিরটা কি সঠিক না জানলেও মুখ লাল। ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়াতে এমনিতেই ইচ্ছে করছে।

আর একদিন।

বাইরে থেকে চোখে পড়ল মিলিটারি জিপ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। কিন্তু মানুষটা বাইরের চেয়ারে বসে নেই। অর্থাৎ ভিতরে শেখরের ঘরে। সঙ্গে সঙ্গে মনে গোটাকতক কঠিন আঁচড় পড়ল শর্মিলার। এরকম স্পর্ধা আর বরদাস্ত করবে না। ডক্টর ভট্টাচার্যকে বলবে কিছু। কিন্তু ঘরে পা দিয়ে অবাক একটু। দিলীপ ডেকা নেই। পার্বতী একা স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে। অস্বাভাবিক গম্ভীর।

—কি ব্যাপার ?

কথা না বলে পার্বতী আঙুল তুলে রোগী দেখার ঘর দেখিয়ে দিল। উঠোন পেরিয়ে শর্মিলা সে ঘরের দরজার সামনে এসে দেখে, দিলীপ ডেকা রোগীর শয্যায় শয়ান, বাবুল তার মাথায় একটা সত্যিকারের নতুন ব্যাণ্ডেজ জড়াচ্ছে।

চাপা রাগে শর্মিলা বলল, বাবুল, ব্যাণ্ডেজ নষ্ট করছিস ?

ছেলে চমকেছে। দিলীপ ডেকা একটা চোখ খুলে তার দিকে তাকালো। গম্ভীর মুখে বলল, এখন কথা বলার উপায় নেই, ইনজেকশন দিয়ে আমাকে অজ্ঞান করে মাথা অপারেশন করা হয়েছে —চটপট সেরে নাও ডক্টর বাবুল, আমার জ্ঞান ফিরে আসছে কিন্তু—

কিন্তু মা এসে দাঁড়াতে খেলা আর জমলই না। শর্মিলার হাসার কথা। কিন্তু রাগ করেই চলে এলো। পার্বতীরও এই কারণেই অমন মুখ, ভাবল।

একটু বাদে দিলীপ ডেকা হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো। শর্মিলা গম্ভীর মুখে বারান্দায় বসে। নইলে ওই লোক সরাসরি শোবার ঘরেই ঢুকে যাবে। কাছে এসে দিলীপ ডেকা থমকালো একটু। একটা ব্যাণ্ডেজের জন্য আপনি কি সত্যি রাগ করলেন নাকি? ঠিক আছে, কাল আপনাকে আমি ক্যাম্প থেকে একটার বদলে এক ডজন ব্যাণ্ডেজ এনে দেব'খন—

শর্মিলা জবাব দিল, তার দরকার নেই। আমি অপচয় পছন্দ করি না।

দিলীপ ডেকার মুখেও সঙ্গে সঙ্গে কপট গাম্ভীর্য। বাট ক্যান ইউ হেল্প ইট?

যে-ভাবে বলল তার অর্থ, শর্মিলা নিজের জীবনটাকেই তো অপচয়ের মধ্যে টেনে নিয়ে চলেছে। খরখরে দৃষ্টিটা তার মুখের ওপর।—আর একটু পরিষ্কার করে বলুন।

হাসছে।—আমার ভেতর-বার ঝকঝকে পরিষ্কার ম্যাডাম, আপনার ভেতরে মেঘ তাই বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে। বাই দি বাই, মাস্টার বাবুলের জন্মদিন কবে বলুন তো ম্যাডাম?

আগের কথাক'টা শুনে এই হৃদ্যতার চেষ্টা ঘুরিয়ে দেবার মতোই কিছু বলবে বলে তৈরি হয়েছিল শর্মিলা। কিন্তু পরের প্রশ্নটা আচমকা যেন বুকের তলা পর্যন্ত কেটে বসল।

—কেন?

—আমি জিজ্ঞেস করতে ও বলছিল আজ পর্যন্ত একবারও ওর জন্মদিন হয়নি। একটা মাত্র ছেলে আপনার, তাই অবাক লাগছিল।

শর্মিলা অপলক চেয়ে রইল খানিক। এই লোককে ইচ্ছে করেই এখন পর্যন্ত বসতেও বলেনি। একটা তারিখই মাথায় এলো তার।

মোহনকে যেদিন খুইয়েছে আর বাবুলকে যেদিন পেয়েছে—সেই তারিখটাই বলবে। বলল—তার কারণ আছে। তারপর সেই তারিখটা উচ্চারণ করল।

চেয়ে আছে। তীক্ষ্ণ চোখে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করল। জিজ্ঞেস করল, তারিখটা আপনার মনে আছে, না তাও ভুলে গেছেন?

দিলীপ ডেকা সচকিত। পরেরটুকু শোনামাত্র মনে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে বিষণ্ণ মুখ।—আই অ্যাম সরি, আই অ্যাম ভেরি ভেরি সরি ম্যাডাম।

চলে গেল। শর্মিলা সেখানেই স্থির বসে। কি ভেবে গেল আঁচ করতে পারে। ধরে নিয়েছে, এক বছর আগে মোহন চলে যাবার ঠিক ওই দিনটাতেই বাবুলের জন্মদিন। তাই বাতিল।

শর্মিলা মিথ্যের রাস্তায় চলে না। চলতে চায় না। ওই তারিখ শোনার পর ওই লোকের মুখে কোনো সংস্কারের আঁচড় পড়ে কিনা দেখতে চেয়েছিল। কারণ, এই ছেলের মুখে ওই লোক নিজের স্ত্রীর আদল দেখে কিনা শর্মিলার এখনো জানা নেই। কিন্তু ওই তারিখ বলার পরেও তেমন অভিব্যক্তি কিছু চোখে পড়ল না।

পার্বতী এসে দাঁড়াল। মুখ সেই আগের মতোই গম্ভীর। বলল, মেজর ডেকা চলে যাবার অপেক্ষায় ছিলাম। বহীনজিকে কিছু জানাবার আছে।

কি যে হয়েছে, এটুকু শুনেই শর্মিলা চমকে উঠল। সাহস করে জিজ্ঞাসাও করতে পারল না, কি।

তারপর পার্বতীর কথা শুনে আবার নির্বাক স্তব্ধ।

··মেজর ডেকা বাইরে বসে বাবুলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে পকেট থেকে চুরুটের কেস বার করেছিল। পার্বতী সামনে আসেনি, ঘর থেকেই লক্ষ্য করছিল। একটা চুরুট ঠোঁটে নিয়ে ধরাতে গিয়েও ধরালো না। খোলা কেসটার চুরুটগুলো বার দুই শুঁকে আবার মুখের চুরুট কেসে রেখে পকেটে ফেলল। বাবুল তখন জিজ্ঞেস করল,

চুরুট খেলে না ? মেজর ডেকা হেসে হেসে বলল, না তোর মা পছন্দ করে না—ছাড়ার চেষ্টায় আছি।

তারপর হাঁক দিয়ে পার্বতীকে ডেকে কফি বানাতে হুকুম করল। কিন্তু কফি তৈরি করে পার্বতীকে বহ্নীনজির শোবার ঘরে দিয়ে আসতে গিয়েও দাঁড়িয়ে যেতে হল। কারণ, মেজর তখন ওই ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাজারিকা সাহেবের দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে বলছে, তোমার মতো দুর্ভাগ্য কারো হয় না বন্ধু, কি পেয়েছিলে ভালো করে জানারও সুযোগ পেলে না।

পার্বতী ঘরে ঢুকে পড়তে ব্যস্ত মুখে কফির পেয়ালা হাতে নিল। দুই এক চুমুকের পর ফুর্তির সুরে বলল, ফার্স্ট ক্লাস. কফি বানানোর জন্য তোমাকে একটা প্রাইজ দেওয়া উচিত। তার একটু বাদেই হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, মাস্টার বাবুলের খুব ছোট বেলার ফোটো আছে নিশ্চয়—দেখাতে পারো ?

পার্বতী শক্ত মুখে মাথা নেড়ে জানিয়েছে, সে-রকম ফোটো আছে কি নেই সে জানে না।

সন্ধ্যার পরে শর্মিলা বারান্দা ছেড়ে ঘরে এসে দাঁড়াল। মোহনের ছবিটা দেখল একবার। ও ঘরে বাবুল পড়তে বসেছে। তাকেও দেখল একটু। কিছু একটা পরিণাম দ্রুত এগিয়ে আসছে এবারে বুঝতে পারছে। যে-কারণে হোক, ওই লোকের সন্দেহ কিছু হয়েছে। ছেলের মুখে স্ত্রীর মুখের আদল বেশি স্পষ্ট দেখছে বলেও হতে পারে। তাছাড়া সন্দেহের আর কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছে না শর্মিলা। অত্যন্ত চতুর বলেই খুব ঘুরিয়ে জন্ম দিনের তারিখ জানতে চেয়েছে। স্বতঃসিদ্ধভাবে কিছু বোঝার জন্যেই বাবুলের শিশু বয়সের ছবি দেখতে চেয়েছে।

পার্বতীর সমস্ত মুখ তপ্ত কঠিন। কারণ, বাবুলই তার একমাত্র লক্ষ্য নয়। বাবুলের ওপর অধিকারের থাবা বসাতে পারলে ওকেও দখলের মধ্যে পাবে ভাবছে। ছেলের প্রতি শর্মিলার দুর্বলতা কতো

দেখছে ততো তার আশা বাড়ছে নিশ্চয়। এই দুর্বলতার ওপর অধিকার বিস্তারের সম্ভাবনা বড় করে দেখছে। সেই কারণেই চুরুট ছাড়ার চেষ্টা। এত সাহস যে ছেলেকে সরাসরি বলেছে তোর মা পছন্দ করে না তাই ছাড়ার চেষ্টায় আছি। আর একই কারণে মোহনের ফোটোর দিকে চেয়ে ওইসব বলেছে। মোহনের দুর্ভাগ্যের কথা বলে নিজের সৌভাগ্যের দিন গুনছে মনে হয়।

শর্মিলা আর চুপ করে থাকবে না। এবারে কিছু করবে। বাবুল দিলীপ ডেকার ছেলে এ যদি নিঃসংশয়ে বুঝতে পারে, তাহলে তার আর কি করার আছে সব জেনে শুনে বুঝে অন্যের ছেলে নিয়ে ও চোরের মতো চলে যাবে না। প্রমাণ করার দায় ওই লোকের। প্রমাণ পেলে ছেলেকে বাপের হাতে দিয়ে দিতে হবে। বুকের ভিতরটা দুমড়ে মুচড়ে গেলেও দিতে হবে। কিন্তু যে প্যাঁচ কষে ওই লোকের তাকেও কাছে টানার মতলব, সেটা ও ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার করে দেবে। এর নড়চড়ও হবে না।

পরদিনই ডক্টর ভট্টাচার্যকে ফোন করে জিপটা পাঠাতে বলল। তার সঙ্গে কিছু দরকারি কথা আছে জানালো। ভট্টাচার্য নিজে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু শর্মিলা বলল, সে-ই যাবে, বাড়িতে কথা হবে না।

জিপ এলো। শর্মিলা গেল।

তাকে বসিয়ে ডক্টর ভট্টাচার্যও সামনে বসল।—কি ব্যাপার? গুরুতর কিছু মনে হচ্ছে?

—খুব নয়। আপনার বন্ধু মেজর ডেকার জন্য আমার কিছু অসুবিধে হচ্ছে।

ডক্টর ভট্টাচার্য আকাশ থেকেই পড়ল।—সে কি। তোমার ছেলেটাকে তো ও দারুণ ভালবাসে, আর তোমারও কত প্রশংসা করে আমার কাছে।

—সেই প্রশংসার আড়ালে তার কিছু প্রত্যাশা স্পষ্ট হয়ে

উঠছে। সেই কারণেই আমার অসুবিধে। আপনি সেটা তাকে স্পষ্ট করে বলে দেবেন।

ডক্টর ভট্টাচার্য হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। তারপর বিমর্ষ সুরে বলল, এই একটা মানুষ নিচু স্তরের কোনো কাজ করতে পারে বা কোনো কথা বলতে পারে আমার ভাবতে কষ্ট হয়। সে-রকম কিছু করেছে বা বলেছে?

শর্মিলা থমকালো একটু। যত রাগই হোক, মিথ্যে বলবে কি করে। জবাব দিল, না, তা করেনি, কিন্তু উঁচু স্তরের আভাস ইঙ্গিত বা মেলামেশাও আমার পছন্দ নয়।

ডক্টর ভট্টাচার্য নির্বাক খানিকক্ষণ। তারপর অনেকটা নিজের মনেই বলল, আশ্চর্য, ইদানীং তোমার আর পার্বতীর সম্পর্কেও হেসে হেসে অদ্ভুত কথা বলে। আর কাল রাতে হঠাৎ আমাকে যা জিজ্ঞেস করল, শুনে আমি তো তাজ্জব। তোমাকে বলবও ভাবছিলাম ··

শর্মিলা সচকিত।—কাল রাতে কখন?

—রাতে ঠিক নয়, সন্ধ্যার পরে।

শর্মিলার ক্যাম্প থেকে বেরিয়েই ওখানে গেছে তাহলে।—ইদানীং কী অদ্ভুত কথা বলে আমার আর পার্বতীর সম্পর্কে?

—তোমরা দুজনেই নাকি তাকে পছন্দ করো না, আর ছেলের সঙ্গে মেলা মেশাটাও বরদাস্ত করতে চাও না। তোমরা নাকি ওকে ভয়ই করো। কেন, তাও নাকি সে এখন একটু একটু আঁচ করতে পারে। তবে সে যা ভাবছে তা আদৌ সত্য না-ও হতে পারে—দিলীপের ও-রকম মনে হয় কারণ, বছর তিন সাড়ে তিন আগের একটা ব্যাপার প্রায়ই তার মনে পড়ে—

—কি ব্যাপার? শর্মিলা অধীর।

—সেটা বলল না, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলেছিল, এখন বলা যাবে না, ভুলও হতে পারে।

শর্মিলারও হঠাৎ মনে পড়ল কিছু। তিন মাস আগে সেই দুর্যোগের পর ডক্টর ভট্টাচার্যের সঙ্গে শর্মিলা যেদিন কামেং মিলিটারি ক্যাম্পে দিলীপ ডেকাকে দেখতে গেছল। সেদিনও এক সময় ওর মুখের দিকে চেয়ে কি-যেন ভাবতে ভাবতে লোকটা বিমনা হয়ে গেছল, শর্মিলার কৃতজ্ঞতার কথা তার কানেও ঢোকেনি। ভট্টাচার্য ডাকতে নিজেই বলেছিল, তিন বছর আগের একটা ব্যাপার মনে পড়তে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। তিন বা সাড়ে তিন বছর আগে কি ব্যাপার ঘটতে পারে শর্মিলা সেদিনও বোঝেনি, আজও ভেবে পেল না।

ডক্টর ভট্টাচাযের দিকেই চেয়ে আছে শর্মিলা।—আর কাল সন্ধ্যার পর আপনাকে কি জিজ্ঞেস করেছিল যে শুনে আপনি তাজ্জব হয়ে গেলেন?

—হ্যাঁ। তোমারই অজস্র প্রশংসা করছিল, মেজাজও বেশ খুশি দেখলাম। হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, দ্যাট লাভলি বয় বাবুল মিসেস হাজারিকার নিজের ছেলে, না তাকে প্রতিপালন করছে?

মুহূর্তের মধ্যে বিবর্ণ ফ্যাকাশে শর্মিলার সমস্ত মুখ। লক্ষ্য করার ফলে ডক্টর ভট্টাচার্যও থমকালো একটু। —কি হল?

—না। তারপর?

—তারপর আর কি, শুনে আমি হাঁ। হেসে বললাম, আমি তো নিজের ছেলে বলেই জানি—তক্ষুণি বাধা দিয়ে ডেকা জিজ্ঞেস করল, কতদিন জানো, জন্মের সময় থেকে জানো? আমি বললাম, না, আট-ন'মাসের সময় প্রথম দেখেছি—কিন্তু তোমার এ-সব উদ্ভট প্রশ্ন কেন?

ডক্টর ভট্টাচার্য বলে গেল, ডেকা হাসতে হাসতে জবাব দিল, আমার এই রকমই আজগুবী চিন্তার মাথা—যেতে দিন। তারপর তোমার বাবার নাম, বিয়ের কথা—এইসব জিজ্ঞেস করতে লাগল। …তোমার এত প্রশংসা করে, তাই কোন ঘরের মেয়ে তুমি আর

তোমার কত সাহস—আমিও সেই গল্প করেছি।···কিন্তু ছেলেটাকে এত ভালবাসে, সত্যিই তাকে তোমার ওখানে আর যেতে বারণ করে দেব ?

শর্মিলার আত্মস্থ হতে সময় লেগেছে একটু। যা হবার হয়েই গেছে, যা বোঝার বোঝা গেছে। তবু প্রাণপণ চেষ্টায় ডক্টর ভট্টাচার্যকে কিছু বুঝতে না দেবার তাগিদ। ঠাণ্ডা মুখে জবাব দিল, বলবেন। বলবেন, তিনি যে-ভাবে আমার জীবন রক্ষা করেছেন তার জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। কিন্তু কোনো কিছুর বিনিময়ে—ঠিক এই কথাটাই বলবেন—কোনো কিছুর বিনিময়ে এই জীবনকে আমি কারো সঙ্গে জড়াতে চাই না।··বাবুলকে এত ভালবাসেন যখন, তার সঙ্গে যে-ভাবে খুশি মেলা-মেশা করুন, স্কুলের পর যেমন ওকে গিয়ে ধরছেন তাই করুন—বেড়িয়ে খেলিয়ে সময়-মতো ঘরে পৌঁছে দিলেই হবে। কিন্তু আমার সঙ্গে কোনো সংস্রব থাকুক এটা আমি চাই না।

ডক্টর ভট্টাচার্য নির্বাক। যা বোঝার বুঝে নিয়েছে। আর কিছু জিজ্ঞেস করার মানে হয় না।

রাত্রি।

ঘরে আলো জ্বলছে। একটা ডাক্তারি বই পড়ার চেষ্টা করছে শর্মিলা। পড়া গেল না। বাবুল ওদিকের ছোট খাটে ঘুমুচ্ছে। পার্বতীও হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। হাতের বই ফেলে দিল। ঘাড় ফিরিয়ে বাবুলের ঘুমন্ত মুখখানা দেখল একবার। তারপর ফোটোর দিকে চেয়ে রইল। একই সঙ্গে আর একটা মুখ চোখের সামনে এগিয়ে আসছে। দিলীপ ডেকা। ছবির ওই একজন ছেলেমানুষ। আর এই একজন পুরুষ। হেলাফেলা করার মতো নয়। এগিয়ে এলে মুখ ঘুরিয়ে নেবার মতো নয়। অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে সে তাকে রক্ষা করেছে। সময়ে ওষুধ পড়তে বাবুলেরও সংকট

কেটেছে। তার বিনিময়ে যেটুকু কৃতজ্ঞতা ওর প্রাপ্য শর্মিলা সেটা কোনো সময় দিতে পারেনি। আজ যে আঘাত দেবার ব্যবস্থা করে এলো তার জন্যও ভিতরে অস্বস্তি।

শর্মিলা সরোষে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলতে চাইল। ঠিক করেছে। যা করা উচিত, তাই করেছে। কোনো দুর্বলতাব প্রশ্রয় তাকে দেবে না। ওর নিজের দুর্বলতার সুযোগ নিতেও দেবে না।

পরদিন আর ওই লোকের দেখা মেলেনি। তারপরের তিন সপ্তাহেব মধ্যেও না। ডক্টর ভট্টাচার্য তাকে যা বোঝাবার ভালো করেই বুঝিয়ে দিয়েছে নিশ্চয়। কিন্তু মুখ ফুটে তাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারেনি। ভদ্রলোক নিজে থেকেই কিছু বলবে আশা করছিল। বলেনি। বাবুলের কাছে শুনেছে, আংকল ডেকা স্কুলের পর রোজই তার কাছে আসে। গল্প করে, ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে খেলা করে, তারপর লোক আর জিপ দিয়ে ঘরে পাঠিয়ে দেয়।

আংকল ডেকাকে বাবুল জিজ্ঞেস করে, সে তাদের বাড়ি আসে না কেন। আগে নাকি ক'দিন খুব কাজের কথা বলেছে। শেষে সেদিন হেসে বলেছে, কেন যাই না, তোর মা-কে জিজ্ঞেস করিস।

তাই জিজ্ঞেস করেছে। আংকল ডেকা কেন আজকাল আসে না?

শর্মিলা রুক্ষ জবাব দিয়েছে, এলে আমার কাজের অসুবিধে হয়। তুইও আর তাকে বাড়ি আসতে বলবি না।

মায়ের কথা দুর্বোধ্য লেগেছে ছেলেটার। আংকল ডেকা তো মায়ের কাজের সময় কখনো আসেই না। বলল, তুমি আসতে বারণ করে দিয়েছ?

—হ্যাঁ।

মায়ের মুখের দিকে চেয়ে ছেলেটা ঘাবড়ে গিয়ে আর কিছু বলেনি। আর পরদিন থেকে স্কুল-ফেরত ও-ছেলে নিজে আর কিছু বলে না। শর্মিলা বোঝে—ভয়ে বলে না, কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও সোজাসুজি জিজ্ঞেস করতে পারে না, হয়তো শুধু বলে

ফিরতে দেরি কেন ?

ছেলে ভয়ে ভয়ে জবাব দেয়, আংকল ডেকা ধরে নিয়ে গেল যে ওইটুকুই।

এরপর লোকটার মতলব কি শর্মিলা ঠাওর করতে পারে না সমস্ত কাজের মধ্যে প্রতিদিন নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়। শেষের প্রস্তুতি। বাবুলকে ছাড়ার প্রস্তুতি। রোজই মনে হয়, আজ হয়তো কিছু ঘটবে। ফয়সলার জন্য দিলীপ ডেকা আসবে, নয়তো সব বলে ডক্টর ভট্টাচার্যকে পাঠাবে। কিন্তু আসতে হবে ওই লোককেই কারণ, সমস্ত প্রমাণ দাখিল করার আগে বাবুলকে ছেড়ে দেবে না বাবুলের আট-ন'মাসের ফোটো সে-ই আগে দেখতে চাইবে। সে সময়ের ফোটো না থেকে পারে না। বিশেষ করে আট মাসের শিশুর সবে অন্নপ্রাশন হয়ে গেছল যখন। এ-ছাড়া আরো প্রমাণ দাখিলের ব্যাপার আছে, যা ছেলের বাপের জানা থাকা একান্ত স্বাভাবিক। ডি-লেখা সেই পুরনো গিনির লকেটের হারের ব্যাপারটা।

কিন্তু শর্মিলা যতোই ভাবুক, ভিতরে ভিতরে এও ঠিক জানে, কাঁচা কাজ করার মানুষ নয় ওই লোক। ছেলের দাবি নিয়ে যদি আসে তো সমস্ত রকম প্রমাণ সহই আসবে। আজ হোক, বা দু-দশদিন পরে হোক, আসবেই।

এখন শীতকাল। অক্টোবরের শেষাশেষি। উঁচু পাহাড়ের গা-মাথা সব বরফে ঢেকে যেতে শুরু করেছে। শুনেছে এরপর রাস্তায়ও তুষার জমাট বাঁধবে। তখন মিলিটারি ট্রেকিং কার ছাড়া চলা ফেরা দায়। এও এক বিষম সময় এখানকার। ঘরের মধ্যে আগুন জ্বেলে রাখতে হয়, পারতে কেউ ঘর ছেড়ে বেরুতেই চায় না।

ডক্টর ভট্টাচার্যের কথা মতো অনেক টাকা খরচ করে বাবুল আর নিজের জন্য বিশেষ রকমের দুপ্রস্থ করে গরম পোশাক আগেই

করিয়ে রেখেছিল। পার্বতীর জন্যেও। অবশ্য শীতের পোশাকের এই খরচও সরকারের কাছ থেকে ফেরৎ পাওয়া যাবে।

বাবুলদের স্কুলের ছুটি চলছে ক'দিন; তাই আংকল ডেকার সঙ্গে আর দেখাশুনা হচ্ছে না বলে মন খারাপ। মায়ের জন্য তো সে-ও বাড়ি আসবে না জানে। সেদিন ডক্টর ভট্টাচার্য আসতে তাকে জিজ্ঞেস করল, আংকল ডেকা তোমার ক্যাম্পে আসে না?

ডক্টর ভট্টাচার্য মাথা নেড়ে জবাব দিল, তিন সপ্তাহের ছুটি নিয়ে তোর আংকল ডেকা বাইরে চলে গেছে।

কথা ক'টা কানে যেতে শর্মিলা ডক্টর ভট্টাচার্যের দিকে তাকালো। সে বলল, লোকটাব মতি-গতি বোঝা ভার, যে সময় কেউ নড়তে চায় না, সে সময় সে বেড়াতে বেরুলো।

শর্মিলাব এক্ষুণি মনে হয়েছে এটা বেড়াতে বেরুনো নয়। বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই গেছে কোথাও। আবার তক্ষুণি এই বেরুনোটা হেঁয়ালিব মতো লেগেছে। কারণ সেখানে যাবে কেন, পার্বতীর দাদার মারফত মেঘালয়ের বাড়ি তো বেচেই দিয়েছে।...তাহলে কিছু সাক্ষী প্রমাণ সংগ্রহের জন্যেই গিয়ে থাকতে পারে। সেখানে অন্য আত্মীয়-পরিজন বা তেমন জানা-শোনা কেউ আছে—যার জিম্মায় কিছু হয়তো রেখে এসেছে।

শর্মিলা দিন গুনছে।

একুশ দিন কেটে গেল। এদিকের রাস্তায় বরফ জমতে এখনো দেরি আছে। উঁচু রাস্তার কথা জানে না শর্মিলা। দুটো পাহাড়ের

মাঝের এই সমতল ভূমিতে শেষের দিকের শীতের চাপে নাকি বরফ জমে। তখন স্কুল ছুটি হয়ে যায়।

বিকেল চারটের সময় সেদিন ঘরের দরজায় মিলিটারি জিপ এসে দাঁড়াল। জিপ থেকে নামল দিলীপ ডেকা। প্রচণ্ড শীত। সেই অনুযায়ী কিন্তু আপাদমস্তক শীতের পোশাকে মোড়া নয়।

ঘর থেকে তাকে দেখা মাত্র শর্মিলা সোজা হয়ে বসল। এবারে সময় হয়েছে তাহলে।

বাবুল ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে দু'হাতে তাকে জাপটে ধরল। সেও তক্ষুণি তাকে দু'হাতে তুলে নিয়ে দুই গালে দুটো চুমু খেল। তারপর নামিয়ে হাত ধরে দাওয়ায় উঠল।

শর্মিলা আস্তে আস্তে ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলো। কি মনে পড়তে বাবুলের হাত ছেড়ে তক্ষুণি আবার জিপের কাছে ফিরে গেল। জিপ থেকে মস্ত একটা প্যাকেট তুলে নিয়ে আবার হাসিমুখে ফিরল। শর্মিলার দিকে চেয়ে বলল, অনেকদিন দেখিনি ছেলেটাকে তাই এলাম····· রাগ করছেন না তো?

—না। বসুন।

সে বসল। মুখোমুখি শর্মিলাও। বাবুল প্যাকেটটা দেখিয়ে সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল, এতে আমার জন্যে কিছু এনেছ বুঝি আংকল ডেকা?

—হ্যাঁ, খুলে দেখ।

তক্ষুণি খুলে ফেলল। ভিতরে একসেট পাহাড়ী গরম পোশাক। এক পোশাকে পা থেকে মাথা অবধি ঢাকা যাবে। চোখ আর নাক মুখের খানিকটা শুধু খোলা।

পোশাক দেখে বাবুল ভারী খুশি। দিলীপ ডেকা বলল, আন্দাজে এনেছি, তবু ঠিক হবে হয়তো·· ভিতরে গিয়ে পরে দেখ।

লাফাতে লাফাতে বাবুল চলে গেল। শর্মিলা বলল, ওর গরম জামা ছিল, না আনলেও হত·।

দিলীপ ডেকা জবাব দিল, এ জায়গায় গরম জামা কখনো বেশি হয় না। আপনার জন্যেও একসেট আনার ইচ্ছে হয়েছিল. সাহস পেলাম না।

মুখের দিকে চেয়েও শর্মিলাব মনে হল, নতুন কবে আবার সাহসের রসদ কিছু পেয়েছে, সেই জোবেই এটুকুও বলাব জোব।

—বেজায় ঠাণ্ডা. এক পেয়ালা স্ট্রং কফি খাওয়াবেন ?

শর্মিলা ঘুবে ঘবেব দিকে তাকালো। দরজার আড়ালে পার্বতী দাঁড়িয়েই আছে—তাবও সংকট অনুমান করতে পাবে শর্মিলা। বলতে হল না, হুকুম বুঝে পার্বতী চলে গেল।

নতুন পোশাক পবে বাবুল বাইরে এলো। তাকে কাছে টেনে দিলীপ ডেকা বলল, খাসা দেখাচ্ছে, বাবুল মাস্টারকে আব চেনাই যাচ্ছে না।

বাবুল বায়না ধরল, অনেকদিন তোমার সঙ্গে বেড়াইনি, আজ জিপে বেড়াতে যাব।

ধমকেব সুবে শর্মিলা বাধা দিল, আজ বেশি ঠাণ্ডা, বেরুতে হবে না।

অগত্যা বাবুল তার কোলে উঠেই হুটোপুটি করল খানিক। কফি আসতে শর্মিলা তাকে হুকুম করল, এবারে আন্টির সঙ্গে ভিতরে যাও। পার্বতীকে বলল, এটা এখন খুলে দাও, ঘরের ভিতর এত গরম দরকার নেই।

সংকেত বুঝে পার্বতী হাত ধরে বাবুলকে একেবারে ভিতরের ঘরে নিয়ে গেল। এখন আর চট করে তাকে এদিকে আসতে দেওয়া হবে না, বহীনজির কথা থেকে এটুকু বুঝে নিয়েছে।

কফি খেতে খেতে দিলীপ ডেকা জিজ্ঞেস করল, এ জায়গায় এই তো প্রথম শীত আপনার—কোনো কষ্ট হচ্ছে না ?

—তেমন কিছু না।

—কড়া শীত এখনো পড়েনি, তখন কিন্তু বেশ অসুবিধে হয়।

শর্মিলা চুপ। যেন আবহাওয়া আলোচনা করতেই আসা হয়েছে।

কফির পেয়ালা সরিয়ে রেখে দিলীপ ডেকা হাসল একটু। বলল, আমি ঠিক যে ছেলেটাকেই দেখতে ছুটে এসেছি, তা কিন্তু সত্যি নয়। যে ধারণা নিয়ে কিছুদিনের জন্য বাইরে গেছলাম···তাতে কোনো ভুল হল না দেখে আপনার ওপর আমার শ্রদ্ধা ডবল বেড়ে গেছে, তাই আপনাকে একটু দেখার লোভে না এসে পারিনি।

এই লোভের আর সাহসের রসদ যে পেয়েছে সেটা বোঝাই যাচ্ছে। শর্মিলা স্থির শান্ত।—আপনি কোথায় গেছলেন?

—প্রথমে গৌহাটি। সেখান থেকে কাছাকাছি আর এক জায়গায়- যে আত্মীয়ের বাড়ি থেকে আমার স্ত্রী সেই কারসড ট্রেনে ছেলে নিয়ে উঠেছিল তাদের ওখানে। সেখান থেকে তেজপুর হয়ে ভালুকপং—তারপর বমডিলা হয়ে সোজা এখানে।

দিলীপ ডেকা খুব হালকা মেজাজেই বলল কথাগুলো। শর্মিলা সোজা চেয়ে আছে।

দিলীপ ডেকা এবার হাসল একটু, তারপর বিনা তাগিদেই বলে গেল, ব্যাপার কি জানেন, ক্যাম্পে যেদিন প্রথম আপনি আমাকে দেখতে গেছলেন, সেইদিনই হঠাৎ বিশেষ কোনো কারণে আমার মনে হয়েছিল, বাবুল আপনার নিজের ছেলে না-ও হতে পারে—

এবারে শুধু যাচাইয়ের প্রশ্ন। কোনোরকম আবেগ আর নিষ্প্রয়োজন। ঠাণ্ডা গলায় শর্মিলা জিজ্ঞেস করল, কেন মনে হয়েছিল?

—সেটা এত হাস্যকর যে না বলাই ভালো এখন। কিন্তু মনে হয়েছিল।

শর্মিলার ধারণা, অজ্ঞান অবস্থায় তাকে ঘরে রাখতে এসে বাবুলকে দেখে পরে ওর মায়ের মুখ মনে পড়েছে বলেই ওই সংশয়। তাই বলছে না। জিজ্ঞেস করল, গৌহাটি গেছলেন কেন?

—গেছলাম, কারণ সন্দেহটা আমার আপনার আর আপনার পার্বতীর জন্য দিনে দিনে বেড়েই চলেছিল। আপনারা চাইতেন না আমি আসি, ছেলের সঙ্গে আমার মেলামেশাটাও পছন্দ করতেন না। কিন্তু নিজেকে আমি ও-রকম হেলাফেলার লোক ভাবি না। শেষে বিশেষ কারণেই আমি বাবুলের শিশু বয়সের ফোটো দেখতে চাইলাম পার্বতীর কাছে। সে প্রথমে চমকে উঠল, তারপর এড়িয়ে গেল। আপনাকে বাবুলের জন্মদিনের কথা জিজ্ঞেস করতে আপনি এমন কথা বললেন যে আমি সত্যি কষ্ট পেলাম। কিন্তু জিপে যেতে যেতে আমার হঠাৎ মনে হল, আপনি যা জবাব দিলেন অর্থাৎ যে তারিখ বললেন তার অন্য অর্থও হতে পারে। ছোট ছেলেকে জন্মদিনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করাটাও আপনার মতো পারসোনালিটির কোনো মহিলার পক্ষে কেন যেন স্বাভাবিক লাগল না। তক্ষুণি গেলাম ডক্টর ভট্টাচার্যের কাছে—সেও শুনলাম বাইরে ছিল, আট ন'মাস বয়সের আগে আপনার ছেলেকে দেখেওনি ...।

এতগুলো কথা বলার পর মুখের দিকে চেয়ে বড় করে দম নিল একটু। শর্মিলাও চেয়ে আছে। তেমনি স্থির, শান্ত।

দিলীপ ডেকা এবার নিজেই বলে গেল, গৌহাটিতে দুটো বড় কাগজের আপিসে গেছলাম। ট্রেন দুর্ঘটনার দিনের কাগজ বার করেছি। আর যে কাগজে ফোটো দিয়ে আপনি বাবুলের বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন সেটাও দেখেছি। সকৌতুকে চেয়ে রইল একটু।—আচ্ছা বাবুলের গলায় ডি লেখা পুরনো গিনির লকেটের হার ছিল একটা—বিজ্ঞাপনে সেটা দেননি কেন?

না শর্মিলার আর কোনো প্রমাণের দরকার নেই। নিষ্পত্তি এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে গেছে। তবু জবাব দিল, কেন দিইনি আপনি সেটা বুঝতে পারেননি? নাকি ভেবেছেন, ওটা আমার আত্মসাৎ করার মতলব ছিল।

—ছি-ছি-ছি-ছি। দিলীপ ডেকা বলল, আপনি আমার ওপর রেগেই গেছেন দেখছি···কিন্তু নিজের এতবড় শোকের মুখেও অজানা অচেনা এক পরের ছেলেকে সত্যিকারের মায়ের আদরে আপনি রক্ষা করেছেন—আসতে আসতে এ-কথা আমার যতবার মনে হয়েছে ততবার চোখ বুজে শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে সামনে দেখতে চেষ্টা করেছি। হ্যাঁ, কেন লকেট আর হারসুদ্ধ বিজ্ঞাপন দেননি সেটা এখন বুঝতে পারছি।

শর্মিলার ঠাণ্ডা মুখে এতটুকু আবেগের চিহ্ন নেই। জিজ্ঞেস করল, আপনার ছেলের ও-বয়সেব কোনো ফোটো আপনার কাছে আছে?

আছে।

এখানে আছে?

—এখানেই আছে।

—কাল নিয়ে আসবেন।

-কি হবে?

—ওটা দেখিয়ে ছেলে নিয়ে যাবেন।·· ···আর একটা কথা ওর সঙ্গে পার্বতীর থাকা দরকার, তা না হলে আপনাদের দুজনেরই খুব অসুবিধে হবে।

দিলীপ ডেকা মুখের দিকে চেয়ে টিপটিপ হাসতে লাগল। তারপর বলল, বাবুলকে নেবার কথা আমি বলিনি।···তবে সর্বদা ওকে চোখের সামনে দেখতে আর পেতে ইচ্ছে করে বটে। কিন্তু ওকে নিলে তার এখানকার মা-কে পাব?

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত মুখ রক্তবর্ণ শর্মিলার। আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল—মিস্টার ডেকা, ইউ আর গোইং ট্যু ফার—ছেলেকে বশ করার পিছনে আপনার এই মতলব আমার অনেকদিন জানা ছিল। আপনি জেনে রাখুন, আমি অনেক সহ্য করেছি, এই কষ্টও সহ্য করতে পারব। যান আপনি।

হঠাৎ ভারী গলায় চাপা গর্জন করে উঠল দিলীপ ডেকা। যেমন সেই দুর্যোগের দিনে পাহাড়ে শুনেছিল।—স্টপ। ছেলে নিয়ে অবসেশন তোমার -আমার নয়। তা না হলে এতদিনে তুমি আমার কিছু মর্যাদা দিতে পারতে। পাহাড়ের সেই ঝড় জলের রাত থেকেই আমি তোমাকে চেয়েছি, তখন ছেলে কোনো প্রশ্ন ছিল না। অজ্ঞান অবস্থায় কখনো কাঁধে কখনো কোলে কখনো বুকে করে পথ ভেঙেছি আর নিজেকে শাসিয়েছি এ-ভাবে যাকে পেয়েছি তাকে রক্ষা করতে না পারলে তোমারও বাঁচাব দরকার নেই বার বার পড়ে গেছি, তখনো প্রাণপণ চেষ্টা করেছি তোমাকে বুকে আগলে রেখে আঘাত থেকে বাঁচাতে।

শুধু তুমি করে কথা বলছে তাই নয় এইসব কথা যা শর্মিলা অনেকবার আঁচ করে মৃত্যু শ্রেয় ছিল ভেবেছে। স্তব্ধ, ক্রুদ্ধ, জ্বলন্ত চাউনি।

দিলীপ ডেকা এবারে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। একটু সামনে ঝুঁকল।—আরো শুনবে? সেদিন বলেছিলাম না, অশোভন কোনো কাজ ইচ্ছে থাকলেও আমি করে উঠতে পারি না? বলেছিলাম না, এর একটা নজির দেখাতে পারি কিন্তু শুনলে তুমি আমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়াবে? সেই নজির শুনবে? বিশ্রামের জন্য তোমাকে কোলে শুইয়ে মাঝে মাঝে বসেছি, টর্চ জ্বেলে ঝুঁকে দেখেছি, ঠাণ্ডায় আর জলে তোমার দুটো ঠোঁট একেবারে নীলবর্ণ হয়ে গেছে—তখন খুব ইচ্ছে হয়েছে নিজের শরীরের সমস্ত তাপ মুখে তুলে তোমার ওই দুটো ঠোঁট গরম করে দিই। যে কেউ হলে তাই করত, আমি পারিনি। মনে হয়েছে, এই দুর্যোগের পাওয়ার মধ্যেও কোথায় একটা শুচিতা আছে—সেটা আমি নষ্ট করতে পারি না। এবারে ভাবো ছেলের কলে ফেলে তোমাকে চেয়েছি, না তোমার জন্যেই তোমাকে চেয়েছি?

চলে গেল।

তেমনি স্তব্ধ, ক্রুদ্ধ চোখে দাঁড়িয়ে শর্মিলা চলে যেতে দেখল। এখনো সে বিশ্বাস করছে না, ওই বাবুলকে টোপের মতো সামনে রেখে তার ওপর দখল নেবার মতলব ছিল না। আর যে-কথাগুলো শুনতে হল তার এক বর্ণও মিথ্যে ভাবতে পারছে না বলেই আরো ঝলসে উঠতে চাইছে। কিন্তু তাও পারছে না, ফলে নিজের উপরেই অন্ধ ক্রোধ।

একে একে আরো পনেরটা দিন কেটে গেল। শর্মিলা প্রতিদিন ভাবছে লোকটা ছেলের ফোটো নিয়ে আসবে। কিন্তু আসছে না। এই না আসাটাও ওকে জব্দ করার ফন্দি ভাবছে। ছেলেকে সামনে রেখে ওর যন্ত্রণা বাড়াচ্ছে। ফোটো দেখতে চাওয়ার কোনো দরকার ছিল না—সেদিনই বাবুলকে ডেকে ফয়সলা করে ফেললে হত।

বাবুল সেদিন স্কুল ফেরত শুকনো মুখে এসে খবর দিল, আংকল ডেকা দু-তিনদিনের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাচ্ছে মা—

শর্মিলা সচকিত। বুকের তলায় ধড়াস করে উঠল কেন জানে না। বাবুলের মুখখানা ভালো করে দেখে নিল একটু।—তোকে বলল?

—বলল তো। আমি মন খারাপ করছি দেখে বোঝালো চাকরি করতে হলে এক জায়গায় থাকা চলে না—অনেক জায়গায় যেতে হয়।

শর্মিলার মুখ লাল। ছেলে ফেলে চলে যাওয়ার এই দয়া অসহ্য লাগছে।

বাবুল বায়না ধরল, কাল ছুটির দিনে আংকল ডেকা আমাকে নিয়ে জঙ্গলে যাবে বলেছে—বড় বন্দুক নিয়ে আসবে, আর আমি আমার এয়ার গান নেব—আমাকে বলেছে, তোর মাকে বলে রাখিস। আংকল ডেকা তো চলেই যাচ্ছে—কাল আমি জঙ্গলে যাব মা।

শর্মিলা হঠাৎ অসহিষ্ণু গলায় ধমকে উঠল, না।

—বা রে, না কেন? এরপর আর কে আমাকে জঙ্গলে নিয়ে যাবে?

শর্মিলা আবারও ধমকে উঠল, যার সঙ্গে কাল যেতে চাস—সে-ই নিয়ে যাবে এরপর যত খুশি জঙ্গলে যাস কাল না।

মা এতটা হতাশ করবে বাবুল ভাবেনি। সঙ্গে সঙ্গে কচি মুখ রাগে লাল।—আমাকে ভোলানো হচ্ছে। কাল আমি যাব যাব—যাবই।

কি যে আগুন জ্বলল মাথায় জানে না, এগিয়ে এসে ওর দু'গালে ঠাস ঠাস করে দুটো চড় বসিয়ে দিল। আরো কয়েকটা চড় পড়ত হয়তো, পার্বতী ছুটে এসে আগলালো। শর্মিলা অস্ফুট ঝাঝালো গলায় বলল, বেইমান ছেলে, এখনই আমার থেকে ওর ওপর টান বেশি তোর।

পরদিন ফোনে ডক্টর ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞেস করল, মেজর ডেকা এখান থেকে ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছেন?

ওদিক থেকে ডক্টর ভট্টাচার্য জবাব দিল, কি ব্যাপার কিছু বুঝলাম না, নিজে থেকেই ট্রান্সফার সীক করে চলল—যদি রাগ না করো একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

—বলুন।

—তোমার সঙ্গে কিছু গণ্ডগোল হয়েছে?

ঠাণ্ডা গলায় শর্মিলা জবাব দিল, না—তিনি যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন আমি তাতে রাজি হইনি।

…ও।

—তিনি কবে যাচ্ছেন?

—খুব সম্ভব পরশু। আপাতত দিন কয়েকের ছুটি বমডিলায় কাটাবে, তারপর বার্মা বর্ডারে চলে যাবে।

একটু থেমে খুব স্পষ্ট করে বলল, শুনুন, বাবুল তাঁর ছেলে,

যাবার আগে তাকে নিয়ে যেতে বলবেন—আমি আর দায়িত্ব নিতে পারব না। কাল বিকেল চারটেয় তাঁকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন, তখন আপনিও থাকলে ভালো হয়।

ওদিকে ডক্টর ভট্টাচার্য কতটা হতভম্ব শর্মিলা তাও আঁচ করতে পারে। প্রায় মিনিটখানেক বাদে আবার তার গলা শোনা গেল। —কি বলছ তুমি আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না—বাবুল তোমার ছেলে নয়?

—না।

—কিন্তু ডেকা তো কখনো বলেনি বাবুল তার ছেলে?

– না বলে আমাকে দয়া করতে চেয়েছেন। আপনি তাঁকে জানিয়ে দেবেন আর পারলে আপনিও আসবেন।

পরদিন।

সকাল থেকে কারো মুখে কোনো কথা নেই। শর্মিলা চুপ, পার্বতী নির্বাক, বাবুলও রাগে গুম। আন্টি তার যাবতীয় জিনিস গোছগাছ করে রাখছে কেন বুঝছে না।

সকাল পেরিয়ে দুপুর গড়ালো। তিনটে নাগাদ কাছাকাছি একজন রোগী দেখার জন্য বেরুবে শর্মিলা। পার্বতীকে বলে গেল, চারটের মধ্যে ফিরবে--যদি দু-পাঁচ মিনিট দেরি হয়ে যায়, যারা আসবে তাদের যেন বসতে বলা হয়।

কারা আসবে পার্বতী জানে। সেও পাথর, কাঁদতে পারছে না।

চারটের মিনিট দশেক আগেই ফিরল শর্মিলা। দরজার কাছে পার্বতী পাংশু মুখে দাঁড়িয়ে। কাছে আসতে ও যা বলল, শোনামাত্র ভেতরটা তেতে উঠল। বহীনজি বেরুনোর কয়েক মিনিটের মধ্যে বাবুলের দু-তিনটে জামা প্যান্ট আনার জন্য কাছের প্রেস-ম্যানের (ইস্তিরিঅলার) ডেরায় গেছল—পনের মিনিটের মধ্যেই ফিরেছে। এসে দেখে বাবুল ঘরে নেই, তার এয়ারগানটাও নেই। এই ফাঁকে

মেজর ডেকা এসে তাকে তুলে নিয়ে গেছে।

গম্ভীর কঠিন মুখে শর্মিলা বারান্দাতেই একটা চেয়ারে বসল। তার হাতের ডাক্তারি ব্যাগ নিয়ে পার্বতী ভিতরে চলে গেল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে মিলিটারি জিপ রাস্তার পাশে এসে দাঁড়াল। জিপ দিলীপ ডেকা নিজেই চালিয়ে আসে। এনজিন বন্ধ করে একা নামল জিপ থেকে। বাবুল নেই।

কাছে আসতে কঠিন ব্যঙ্গের স্বরে শর্মিলা জিজ্ঞেস করল, ছেলেকে আগেই সরিয়ে রেখে এলেন?

মেজর ডেকা বিমূঢ়।—ছেলে··মানে বাবুলকে? কেন—সে কোথায়?

শর্মিলা চমকে দাঁড়িয়ে উঠল, কেন, আপনি তাকে জঙ্গলে নিয়ে যাননি?

—না তো। আমার এসে নিয়ে যাবার কথা ছিল, কিন্তু আপনি চারটেয় আসতে বলেছেন, চারটেয় এসেছি।

আজ আপনি করে বলছে খেয়াল করেও শর্মিলা ব্যাকুল স্বরে বলল, কিন্তু·ও তো এক ঘণ্টা ধরেই ঘরে নেই—এয়ারগানটাও নেই।

অস্ফুট স্বরে দিলীপ ডেকা বলল, কি সর্বনাশ, একলা জঙ্গলে ঢুকে থাকলে··

··সঙ্গে সঙ্গে জিপের দিকে ছুটল সে।

—দাঁড়ান। দিশেহারার মতো শর্মিলাও ছুটে গিয়ে স্টার্ট দেবার আগে জিপে উঠল। জিপ গর্জন করে ছুটল।

কাছের জঙ্গল মাইল দেড়েকের মধ্যে। অবশ্য পাহাড়ের সর্বত্রই জঙ্গল। তবু প্রথমেই দিলীপ ডেকার মনে হল এয়ারগান নিয়ে গেছে যখন, ওই কাছের বড় জঙ্গলের দিকেই গেছে।

তার মুখের দিকে চেয়ে শর্মিলা বড় কিছু বিপদের আশংকায় থর থর করে কাঁপছে।

দিলীপ ডেকা বলল, এ-জঙ্গলে ভালুক আর সাপের উপদ্রব বেশি

—তার থেকে বেশি ভয়, জঙ্গলে একবার ঢুকে পড়লে আর বেরুবার পথ খুঁজে পাবে না।

শর্মিলা প্রায় চেঁচিয়েই বলে উঠল, কেন, আপনি ওকে লোভ দেখালেন—ও ভেবেছে আপনি একাই জঙ্গলে চলে গেছেন--তাই আমার অবাধ্য হয়েও গেছে—একেবারে তাকে নিয়ে গিয়ে যেমন খুশি রাখতেন।

সঙ্গে সঙ্গে পল্টা গর্জন করে উঠল দিলীপ ডেকা।—ডোন্ট টক্। অ্যাণ্ড্ ডোন্ট ডিসটার্ব মি।

তিন মিনিটের মধ্যেই জঙ্গলের ধারে পৌঁছুলো। জিপ থামিয়ে দিলীপ ডেকা পিছনের সিট থেকে বন্দুক আর বড় টর্চটা হাতে নিল। যদি জঙ্গলে যাওয়া হয় এই জন্য সঙ্গে এনেছিল। শর্মিলাও জিপ থেকে তার সঙ্গে সঙ্গে নেমেছে।

দিলীপ ডেকা বলল, আপনার জিপে থাকা ভালো।

ব্যাকুল সুরে শর্মিলা বলে উঠল, না না, আমি আপনার কোনো অসুবিধে করব না, আপনি দয়া করে আমাকে বাধা দেবেন না।

জঙ্গলের ভিতরে অন্ধকার। জ্বলন্ত টর্চ শর্মিলার হাতে। এক ঘণ্টার ওপর ঘোরাঘুরি করেও বাবুলের চেহারা দেখা গেল না। এখানে ঢুকে থাকলে পথ হারিয়েছে কোনো সন্দেহ নেই।

এরপর নাম ধরে জঙ্গল কাঁপিয়ে চিৎকার করে বাবুলকে ডাকতে ডাকতে চলল দিলীপ ডেকা।

—বাবুল। বাবুল।

—বা-বু-ল! বা-বু-ল!

—বাবু-ল! বা-বুল!

এমনি দশ মিনিট ধরে অবিশ্রান্ত ডাকাডাকির পর হঠাৎ এক-দিকের দূর থেকে সাড়া পেল, আংকল ডে-কা। আমি এইখানে!

ওর গলা পেয়ে শর্মিলার মনে হল এবারে সে-ই বুঝি জ্ঞান হারাবে। আর্তস্বরে সে-ও ডেকে উঠল, বা-বু-ল।

ডেকে ডেকে আর জবাব ধরে ধরে ডেকা আরো খানিকটা এগোতে শর্মিলার টর্চের আলোয় দেখা গেল, একটা এবড়ো-খেবড়ো মস্ত পাথরের ওপর এয়ারগান কোলে বাবুল বসে। ভয়ে বিবর্ণ। বলল, বেরুতে পারছিলাম না, শেষে দূরে একটা ভালুক দেখে এখানে এসে বসে আছি।

এতক্ষণে মুখে হাসি দেখা গেল দিলীপ ডেকার। দু'হাত বাড়িয়ে বলল, বেশ করেছিস, তুই একটা মানুষের মতো মানুষ হবি—এখন নেমে আয় বাবা—দেখিস খুব সাবধানে পা রেখে রেখে আয়।

কাছাকাছি এসে খানিক উঁচু থেকেই দিলীপ ডেকার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবুল। তাকে একটু বুকে জড়িয়ে রেখে শর্মিলার কোলে তুলে দিল। শর্মিলা তার গালে গাল ঠেকিয়ে একটা উদ্গত কান্নার বেগ সামলালো। তারপর আস্তে আস্তে নামিয়ে দিল।

জিপেও সমস্ত পথ বাবুলকে কোলে নিয়ে শর্মিলা চুপ করে বসে ছিল। দিলীপ ডেকা এমন কি বাবুলের মুখেও একটি কথা নেই। কত বড় বিপাকে পড়েছিল ছেলেটা তা মর্মে মর্মে বুঝছে।

ডক্টর ভট্টাচার্য বাইরের বারান্দায় বসে ছিল। পাশে পার্বতী পাংশু মুখে দাঁড়িয়ে। বাবুলকে সুদ্ধ জিপ থেকে নামতে দেখে তাদেরও ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

দাওয়ায় উঠতে ডক্টর ভট্টাচার্য জিজ্ঞেস করল, কোথায় ছিল?

দিলীপ ডেকা এক কথায় জবাব দিল, জঙ্গলে।

—কি সর্বনাশ!

দিলীপ ডেকা একটা চেয়ার টেনে বসল। পার্বতীকে বলল, বাবুলকে ভিতরে নিয়ে যাও, মুখ হাত গরম জলে ধুইয়ে একটু দুধ খাইয়ে কম্বলের নিচে ঢুকিয়ে দাও।

বাবুলের হাত ধরে পার্বতী ভিতরে চলে গেল। ডক্টর ভট্টাচার্য দিলীপ ডেকার দিকে ফিরে বললেন, তোমাকে তো খুব ক্লান্ত

দেখাচ্ছে, আগে একটু গরম চা বা কফি খেয়ে নাও।

—নো, থ্যাংকস। শর্মিলাকে বলল, বসুন, আপনি কি জন্যে ডেকেছিলেন আমি জানি।

শর্মিলা বসল। আগে কতবাব এই লোক নিজে থেকে কফি চেয়ে খেয়েছে, কিন্তু আজ ইচ্ছে থাকলেও শর্মিলা আর একবার অনুরোধ করতে পাবল না।

দিলীপ ডেকা গম্ভীব শান্ত মুখে বলল, আমাব একটাই অন্যায় হয়েছে, সব জেনেশুনেও আপনাকে আমি এক দারুণ সন্দেহের মধ্যে রেখেছিলাম। আজ জেনে নিশ্চিত হোন, বাবুল আমাব ছেলে নয়।

—সে কি! বিস্ময়ে উত্তেজনায শর্মিলা চেযাব ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

—আমাব ছেলে তার মাযেব সঙ্গেই চলে গেছে। দু'বছর পূবে দেশে ফিরে ছেলে আব তার মায়েব মৃত্যু সংবাদ শুনে আমি গৌহাটি ছুটে গেছিলাম। খববেব কাগজের আপিসে গিযে সেই অ্যাকসিডেন্টের ফাইল টেনে বাব কবেছি। সব পড়েছি। কয়েকদিনের কাগজ উল্টে আপনার নাম ঠিকানা দেওয়া বিজ্ঞাপনে বাবুলের ছবি দেখেছি। আমার ছেলে হলে আমি তখুনি এসে দাবি করতাম। কথায় কথায় কাগজেব এক ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন, যিনি ওই বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, অর্থাৎ ডাঃ শর্মিলা হাজাবিকাব স্বামীও ওই ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে মাবা গেছেন ওই শিশু তাঁর স্বামীব কোলে ছিল। আমি জিজ্ঞেস কবেছিলাম, শিশুটির আপনাবজনের কোনো খোঁজ পাওয়া গেছে কিনা? কাগজের ভদ্রলোক সেটা বলতে পারল না।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে খাপে মোড়া ছোট একটা পাসপোর্ট সাইজ ফোটো বার করে শর্মিলার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এই দেখুন, আমার স্ত্রী আর ছেলের ছবি।

শর্মিলা তাড়াতাড়ি সেটা নিয়ে দেখল। কানে যা শুনছে চোখে যা দেখছে এ-যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। ছুটে ঘরে ঢুকে দেরাজ থেকে ফোটো অ্যালবামটা নিয়ে আবার বাইরে এলো।

বাবুলের সেই আট মাসের ছবিই বার করল্ল। মেলালো। না। কোথাও এতটুকু মিল নেই।

হাত বাড়িয়ে দিলীপ ডেকা তার ফোটোটা নিয়ে আবার পকেটে রাখল। শর্মিলা উদগ্রীব, উন্মুখ। —কিন্তু আপনি তাহলে ওর হার আর গিনির ওপর ডি-লেখা লকেটের খবর জানলেন কি করে?

—বলছি। তার আগেও কিছু কথা আছে। তেমনি ঠাণ্ডা গম্ভীর মুখে দিলীপ ডেকা বলে গেল, দাদার মুখে শুনেছিলাম আপনার স্বামীও একই ট্রেন অ্যাকসিডেণ্টে মারা গেছেন।

—আমার স্মরণশক্তি একটু বেশি মাত্রায় প্রখর। ক্যাম্পে আপনি যেদিন আমাকে দেখতে গেছলেন, সেদিনই হঠাৎ তিন বছর আগের কাগজে দেখা আপনার সেই বিজ্ঞাপন আর কাগজের আপিসের ভদ্রলোকের কথা আমার মনে পড়ে গেল। আর তখন থেকে ওই বাবুল আপনার সেই পাওয়া ছেলে কিনা এটাও মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে লাগল। তারপর দুদিন আপনাদের কাছে গিয়ে আপনার আর পার্বতীর আমার প্রতি ব্যবহার দেখে সন্দেহ হল, আমি কেন আপনাদের কাছে অবাঞ্ছিত, কেন আপনারা আমাকে এড়িয়ে চলতে চান। আপনারা জানতেন, অ্যাকসিডেণ্টে আমারও ছেলে গেছে, আপনাদের হয়তো ধারণা, ওই ছেলে আমার ছেলে হতে পারে। অবশ্য যদি বাবুল আপনার নিজের ছেলে না হয়ে থাকে। কিন্তু আমার সন্দেহ দিনে দিনে বাড়ছিল। তখনো ডি-লেখা লকেট হারের কথা আমি জানি না।

শুধু শর্মিলা নয়, ডক্টর ভট্টাচার্যও নিবিড় আগ্রহ নিয়ে শুনছে। এবার ডক্টর ভট্টাচার্যই জিজ্ঞেস করল, তারপর?

—তারপর কেবলই সেই বিজ্ঞাপনের শিশুর মুখ মনে করতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু সেটা কিছুতেই মনে পড়ল না। পার্বতীকে ওর সে-সময়ের ফোটো দেখাতে বললাম, সে দেখালো না। মিসেস হাজারিকাকে বাবুলের জন্মদিনের তারিখ জিজ্ঞেস করতে উনি যে

দিনের কথা বললেন, শুনে প্রথমে খটকা বাঁধল, আমিই ভুল করেছি কিনা। পরে অন্য অর্থ হঠাৎ মাথায় এলো। তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, বাবুল মিসেস হাজারিকার নিজের ছেলে কিনা—তুমি আকাশ থেকে পড়লে। তোমার কাছ থেকে ওর বাবার কথা জেনে নিয়ে তিন সপ্তাহের ছুটিতে গৌহাটি গেলাম। আবার পুরনো কাগজের ফাইল ঘেঁটে সেই বিজ্ঞাপন বার করলাম। কিন্তু আট মাসের শিশুর সঙ্গে সাত বছরের ছেলের চেহারা মিলবে কি করে। —ওঁর বাপের বাড়ি গিয়ে ওঁর দুই বোনের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে মিসেস হাজারিকার খবর আর তাঁর পাওয়া ছেলের খবর জিজ্ঞেস করলাম। কারণ, সেই ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে আমার ছেলে নিখোঁজ হয়েছে—তাই আমার জানা দরকার। বোনেরা এঁর কোনো খবরই রাখেন না, কিন্তু আমার যেটুকু জানা দরকার সেটুকু তাঁরা জানালেন। মিসেস হাজারিকা নিঃসন্তান। বিজ্ঞাপনের কথাও বললেন, আর 'ডি' লেখা লকেট হারের কথা বললেন।

চেয়ার ঠেলে দিলীপ ডেকা উঠে দাড়াল। শর্মিলার দিকে চেয়ে বলল, আচ্ছা, আর আপনাকে বিরক্ত করতে আসব না—গুড নাইট।

চলে গেল। একটু বাদে তার জিপটাও চোখের আড়াল হয়ে গেল।

শর্মিলা স্থাণুর মতো বসে। হতভম্ব, নির্বাক। ডক্টর ভট্টাচার্যের মুখেও বহুক্ষণের মধ্যে একটি কথা নেই। তারপর দিলীপ ডেকার প্রসঙ্গেই টুকটাক এটা-সেটা বললেন। সবই স্নেহের আর প্রশংসার কথা। কিন্তু শর্মিলার কানে কিছু ঢুকছে না। সে কিছু ভাবতেও পারছে না। জ্ঞান-বুদ্ধি সব যেন একসঙ্গে লোপ পেয়ে গেছে।

ঘণ্টাখানেক বাদে ডক্টর ভট্টাচার্য বলল, আজ চলি—

এতক্ষণে আত্মস্থ হল শর্মিলা। জিজ্ঞেস করল, মেজর ডেকা কবে চলে যাচ্ছে এখান থেকে?